(B) 234 (B)

মানুষ ও তার ১
সভ্যতার ইতিহাস



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of **History for Class VI**
Vide T. B. No. VI/H/79/132 dated 5.12.79

447
6.7.89

মানুষ ও তার সভ্যতার ইতিহাস

23H (B)

(প্রথম ভাগ)

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

শ্রীমৃণালকান্তি চক্রবর্তী এম. এ.
অধ্যাপক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নব ব্যারাকপুর

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

গ্রন্থ নিলয় ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন• কলি-৯

তৃতীয় সংস্করণ
ডিসেম্বর, ১৯৮২

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 6. 7. 89
Acc. No 4493

H VI
MR1

মূল্য : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

প্রকাশক : প্রেমময় মজুমদার, ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীঅবনীমোহন রায়, তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১২ বিনোদ সাহা লেন, কলিকাতা-৬

বিষয়-সূচী

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : ... ... ১—৪

ক· ১ম পাঠ : কেন আমরা ইতিহাস পড়ব ? খ· ২য় পাঠ : কি ক'রে প্রাচীনযুগের মানুষের কথা জানতে পারব ?

দ্বিতীয় অধ্যায় : আদিম মানুষ ... ... ৫—১৩

ক· ১ম পাঠ : আগুনের ব্যবহার, খাদ্য সংগ্রহ। খ· ২য় পাঠ : প্রাচীন প্রস্তর যুগ ; অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস, ব্যবহার। গ· নব্য-প্রস্তর যুগ (খ্রীঃ পূঃ আট হাজার অব্দ)। ৩য় পাঠ : উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি। ৪র্থ পাঠ : কৃষিকাজ ও খাদ্যদ্রব্য। ৫ম পাঠ : পশুপালন। ৬ষ্ঠ পাঠ : মাটির বাসনপত্র তৈরির পদ্ধতি, চাকা আবিষ্কার। ৭ম পাঠ : কাপড় বোনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাসস্থান। ৮ম পাঠ : ধর্ম, শিল্পকলা ও ভাষা।

তৃতীয় অধ্যায় : তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ ... ... ১৩—১৭

১ম পাঠ : শহরের সৃষ্টি, উৎপাদন-রীতির পরিবর্তন। ২য় পাঠ : ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক জীবনের পরিবর্তন, শ্রেণীর সৃষ্টি, উপজাতির মধ্যে যুদ্ধ, রাজ্যের প্রাথমিক উৎপত্তি। ৩য় পাঠ : নদীর তীরের অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ।

চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচীন সভ্যতা (৩০০০-১৫০০ খ্রী. পূ. অব্দ) ১৮—৫৪

ক· মেসোপোটামিয়া—১ম পাঠ : অবস্থিতি ও প্রাচীনত্ব, প্রথম সভ্যতা বিকাশের কারণ। ২য় পাঠ : জমির উর্বরতা, শস্য, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ। ৩য় পাঠ : নানা ধরনের কাজকর্ম। ৪র্থ পাঠ : সুমেরীয়দের নানা কৃতিত্ব। খ· মিশর—১ম পাঠ : অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি। ২য় পাঠ : ফারাও, পুরোহিত, রাজস্ব-আদায়কারী ও সৈন্য। ৩য় পাঠ : ব্যবসা-বাণিজ্য, লিখন-পদ্ধতি ও লেখক। ৪র্থ পাঠ : পিরামিড। ৫ম পাঠ : ধর্ম। ৬ষ্ঠ পাঠ : প্রধান জীবিকা। গ· সিন্ধু সভ্যতা—১ম পাঠ : সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার। ২য় পাঠ : শহর-পরিকল্পনা। ৩য় পাঠ : খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিস, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য। ৪র্থ পাঠ : উপাসনা। ৫ম পাঠ : সিন্ধু-সভ্যতার সমাজের শ্রেণীবিভাগ। ঘ· চীন—১ম পাঠ : হোয়াং হো ও ইয়াংসি কিয়াং উপত্যকা, প্রাচীনযুগের চীন ও পুরাণ কাহিনী। ঙ· প্রাচীনযুগের নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য—১ম পাঠ : অর্থনৈতিক জীবন। ২য় পাঠ : সামাজিক জীবন।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ লৌহযুগের সমাজ … … ৫৪—৫৮

১ম পাঠ : লোহার আবিষ্কার, ব্যবহার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। ২য় পাঠ : রাজার সৃষ্টি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ব্যাবিলন … … ৫৮—৭১

ক. ব্যাবিলন—১ম পাঠ : চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য। ২য় পাঠ : মন্দির ও পুরোহিত, শিল্প ও সংস্কৃতি। ৩য় পাঠ : হামুরাবির প্রচলিত আইন, সামাজিক অবস্থা। খ. মিশর সাম্রাজ্য—১ম পাঠ : মিশরের উপনিবেশ। ২য় পাঠ : পুরোহিতদের প্রতিপত্তি। গ. ইরান—১ম পাঠ : পারস্যের উত্থান। ২য় পাঠ : জরথুস্ত্র। ঘ. ইহুদি—১ম পাঠ : হিব্রুজাতি। ২য় পাঠ : মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদিদের পলায়ন, দাসত্ব-মুক্তি।

সপ্তম অধ্যায়ঃ গ্রীস … … ৭২—৮৭

১ম পাঠ : গ্রীস-সভ্যতায় ক্রীটের প্রভাব। ২য় পাঠ : হোমারের যুগ। ৩য় পাঠ : নগর-রাষ্ট্র, উপনিবেশ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। ৪র্থ পাঠ : এথেন্স ও স্পার্টা—সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন। ৫ম পাঠ : স্পার্টা ও এথেন্সের সম্পর্ক। ৬ষ্ঠ পাঠ : এথেন্সের সাংস্কৃতিক গৌরব। ৭ম পাঠ : কয়েকজন প্রধান মনীষীর পরিচয়। ৮ম পাঠ : ম্যাসিডন—আলেকজাণ্ডার—তাঁর ভারত আক্রমণ। ৯ম পাঠ : সাম্রাজ্যের পতন, রোমানদের গ্রীক জয়।

অষ্টম অধ্যায়ঃ রোম … … ৮৮—১০০

১ম পাঠ : রোম নগরের পত্তন, রোম-কার্থেজ যুদ্ধ। ২য় পাঠ : প্রাচীন রোমের সমাজ। ৩য় পাঠ : রোমের নাগরিক অধিকার। ৪র্থ পাঠ : ক্রীতদাস প্রথা ও ক্রীতদাস বিদ্রোহ। ৫ম পাঠ : জুলিয়াস সীজার; প্রজাতন্ত্রের অবসান। ৬ষ্ঠ পাঠ : রোমের নতুন সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যের পতন। ৭ম পাঠ : খ্রীষ্টধর্মের প্রচার।

নবম অধ্যায়ঃ চীন … … ১০১—১০৪

১ম পাঠ : শাঙ্ বংশ; কনফুসিয়াস ও তাঁর শিক্ষা; চীনের প্রাচীর ২য় পাঠ : চিঙ্ সাম্রাজ্য।

দশম অধ্যায়ঃ প্রাচীন ভারত … … ১০৫—১২৪

১ম পাঠ : আর্যদের ভারত আগমন। ২য় পাঠ : বেদ। ৩য় পাঠ : আর্যদের প্রাচীন সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি। ৪র্থ পাঠ : মহাকাব্য। ৫ম পাঠ : জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান। ৬ষ্ঠ পাঠ : প্রাচীন সাম্রাজ্য। ৭ম পাঠ : প্রাচীন বঙ্গদেশ। ৮ম পাঠ : বিদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ (মধ্য-এশিয়া)। ৯ম পাঠ : বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ। ১০ম পাঠ : প্রাচীন ভারতের শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞান।

প্রথম অধ্যায়

ক. ১ম পাঠ ঃ কেন আমরা ইতিহাস পড়ব ?

সৃষ্টির ইতিহাসে এই পৃথিবীর নবীনতম প্রাণী হচ্ছে মানুষ। সেই সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মানুষ কি ক'রে নিজেকে টিকিয়ে রাখে, খাবার যোগাড় ও তৈরি করতে শেখে. নানাধরনের হিংস্র জন্তুর হাত থেকে প্রাণ বাঁচায়, শীত ও গরমের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য পোশাক ব্যবহার করতে শুরু করে—আদিমযুগের মানুষের বংশধর হিসেবে আমাদের সে-সব কথা জানা অত্যন্ত দরকার। প্রতিদিন মানুষ এবং তার চারপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতির বদল হচ্ছে। বিরুদ্ধ পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে সবসময়ই তার যুদ্ধ চলছে। প্রতি মুহূর্তের এই পরিবর্তন এবং সংগ্রামের কাহিনীকেই আমরা ইতিহাস বলি। যুগে যুগে মানুষের সমাজের, রীতিনীতির, চিন্তাভাবনার পরিবর্তন, নানা কাজ-কর্মের চেষ্টা এবং প্রকৃতি-পরিবেশের উপর তার অধিকার বিস্তারের কাহিনীই হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়। যদিও খাবার যোগাড় ও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কাহিনীই মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাহলেও কেবল এ দু'টির মধ্যেই মানুষ নিজেকে আটকে রাখেনি। বাঁচবার জন্য প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলো মেটাবার পরই মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের বহু বহু রহস্যের মূল কারণ খুঁজে দেখার চেষ্টা শুরু করে। তার এই চেষ্টার ফলেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, সভ্যতা ও ধর্মের বিকাশ সৃষ্টির প্রথম যুগেই আমরা দেখতে পাই। প্রাচীনযুগের কোন অজ্ঞাত দিনে যেদিন মানুষ প্রথম আগুনের ব্যবহার জানল, সেদিন থেকে শুরু হল তার এগিয়ে চলা, যে-চলা আজও শেষ হয়নি। তারপর সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও নতুন নতুন অভিজ্ঞতার আলোয় মানুষ তার পুরনো পৃথিবীকে নতুন করে বিচার করতে শেখে এবং তার পুরনো চিন্তাকে নতুন কালের উপযোগী ক'রে বদলে নেয়। বিভিন্ন যুগে নানাকারণে মানুষের জীবনের ও সমাজের অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও, সব কিছু বদলে যায় না। সাধারণভাবে বলতে গেলে বর্তমান যুগের মানব-সমাজ

অতীতের ছাঁচ মাত্র। সুতরাং বর্তমান পৃথিবী আর মানব-সমাজকে বিশেষভাবে জানতে হলে তার অতীত ইতিহাস ভাল ক'রে পড়া দরকার। ইতিহাসের কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে আছে অতীত যুগের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতার কাহিনী। এইসব কাহিনীর অভিজ্ঞতা নিয়েই গড়ে উঠেছে বর্তমান যুগের মানুষের সমাজ আর এর উপরই নির্ভর করছে তার ভবিষ্যতে এগিয়ে চলার কাহিনী।

● ইতিহাস পড়ে আমরা :

১। বহু বহু যুগের আগের মানুষের কথা জানতে পারি।

২। পুরনো ইতিহাস জানতে পারলেই আমাদের ভবিষ্যৎ ভাল ক'রে গড়ে তুলতে পারব।

খ. ২য় পাঠ : কি ক'রে প্রাচীনযুগের মানুষের কথা জানতে পারবে ?

প্রাচীনযুগের আদিম মানুষ লিখতে পড়তে জানত না। সুতরাং সে-যুগের কোন লেখা-ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়। তখনও সে-যুগের মানুষ কোন ইটের বাড়ি বানাতে শেখেনি। তাই কোন প্রাসাদ বা শহরের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি এমন কিছু পাওয়া যায় না যা থেকে আমরা সে-যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। তবে সে-যুগের মানুষেরা শিকারের জন্যে যেসব অসমান ও অমসৃণ পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ও নানাধরনের জিনিসপত্র ব্যবহার করত, তা বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। এইসব অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্রেরও বিভিন্ন যুগে নানা পরিবর্তন হয়েছে। এগুলো থেকে সে-যুগের মানুষদের জীবনযাত্রা ও ইতিহাস সম্পর্কে কিছু অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিরুদ্ধ প্রকৃতির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ পাহাড়ের গুহায় বাস করত। তারা অবসর সময়ে এইসব গুহার গায়ে ছবি আঁকত। এসব ছবি ও তাদের ব্যবহারের নানা জিনিসপত্র থেকে তাদের চিন্তা-ভাবনা, তাদের পরিচিত জীবজন্তু এবং জীবনযাত্রার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর স্পেনের আলটামিরাতে,

দক্ষিণ ফ্রান্সের লা মথ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আলবামা, উত্তর আফ্রিকায় এবং ভারতবর্ষের মধ্য-ভারত থেকে দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত নানাঅঞ্চলে প্রাচীনযুগের গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বেত্রবতী ও চম্বল উপত্যকায় ছত্রিশগড়ের সিংহলপুর ও রায়গড় ইত্যাদি স্থানে, উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুরের লিথুনিয়া, কহবর ও ভালদরিয়ায় এবং বিহারের চক্রধরপুরের কাছে প্রাচীন যুগের গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব গুহাচিত্রের অনেকগুলো বেশ উঁচু মানের এবং তা থেকে শিল্পীর নিপুণতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।



গুহাচিত্র

কিন্তু সময় বদলায় আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বভাবেরও বদল হয়। ধীরে ধীরে মানুষ দল বেঁধে সামাজিক জীব হিসেবে বসবাস শুরু করে। চাষবাস, পশুপালন প্রভৃতি সে শেখে আর সুবিধাজনক প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থায়িভাবে জীবনযাপন করতে আরম্ভ করে। ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনোভাব প্রকাশ করার জন্যে প্রাচীনযুগের মানুষ নানাধরনের সাঙ্কেতিক লিপিচিত্র এবং অক্ষর আবিষ্কার করে। তখন থেকেই লেখা-ইতিহাসের শুরু। অল্প হলেও এই লেখা-ইতিহাস থেকেই আমরা পৃথিবীর প্রথম যুগের সভ্যতার—ব্যাবিলন, সুমের, মিশর, চীন, ভারতবর্ষ, গ্রীস ও রোম প্রভৃতি দেশের ইতিহাস জানতে পারি।

পরের যুগে লেখার জন্য প্যাপাইরাস, তুলটকাগজ, ভূর্জপত্র, তালপাতাও ব্যবহার করা হত। প্রাচীনকালে লেখা নানা ধর্মগ্রন্থ এবং কাব্য ও সাহিত্য ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য জানার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি থেকে প্রাচীনযুগের ইতিহাস জানা যায়। শুধু ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করেও সে-সময়ের কোন কোন লেখক বই লেখেন। এদের মধ্যে গ্রীসদেশের হেরোডোটাস, জেনোফন, প্লিনি, অ্যারিয়ান থুকিদিদিস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। মেগাস্থিনিস,

কা হিয়েন প্রভৃতি পর্যটকদের দিনপঞ্জি ও ভ্রমণকাহিনী থেকেও প্রাচীনকালের অনেক কথা জানা যায়।

প্রাচীনকালের রাজপ্রাসাদ, মন্দির, দুর্গ, সমাধিস্তম্ভ, স্মৃতিস্তম্ভ, তাম্রলিপি, শিলালিপিও সে-যুগের ইতিহাস জানার ব্যাপারে খুব সাহায্য করে। মিশরের পিরামিড, অশোকের স্তম্ভ, ভারত, চীন, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে ঐ সব দেশের ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। প্রাচীনযুগের মুদ্রা থেকেও সে-যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এই সব মুদ্রা থেকে আমরা তখনকার অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ইতিহাস জানতে পারি।

● প্রাচীনকালের ইতিহাসের জন্য আমাদের জানতে হবে :

১। প্রাচীনযুগের মানুষের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র এবং তাদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র।

২। বিভিন্ন গুহাচিত্র।

৩। সাঙ্কেতিক চিত্রলিপি, লেখা-ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ, কাব্য ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণলিপি ও দিনপঞ্জি।

৪। প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ, মন্দির দুর্গ, স্মৃতিস্তম্ভ, তাম্রলিপি, শিলালিপি ও মুদ্রা।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস আমরা পড়ি কেন?

২। ইতিহাস পড়ে আমরা কি জানতে পারি?

৩। প্রাচীনযুগের ইতিহাস জানবার উপায় কি?

৪। প্রাচীনযুগের গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে এমন কয়েকটি জায়গার নাম কর।

৫। প্রাচীনযুগের কয়েকজন ঐতিহাসিকের নাম লেখ।

৬। পিরামিড কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?

৭। প্রাচীনযুগের মুদ্রা থেকে আমরা কি কি জানতে পারি?

৮। প্রাচীনযুগের দুজন পর্যটকের নাম লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম মানুষ

ক. ১ম পাঠ : আগুনের ব্যবহার, খাদ্য সংগ্রহ

আদিম যুগের মানুষ সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি। তবে অনেক জায়গায় মাটির নিচে তাদের কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া গেছে। নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা এই সব কঙ্কালের সাহায্যে প্রাচীনযুগের মানুষের আকৃতি সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। মানুষের এই প্রাচীনতম পূর্ব-পুরুষ- ছিল কদাকার স্তন্যপায়ী প্রাণী। বর্তমান যুগের মানুষের তুলনায় সে যথেষ্ট বেঁটে ছিল। রোদের তাপে ও শীতের ঠাণ্ডায় তার গায়ের চামড়া হয়ে যেত গাঢ় কালো ও বাদামি রঙের। তার প্রায় সমস্ত দেহ কর্কশ ও লম্বা চুলে ঢাকা ছিল। তার হাতের আঙ্গুল-গুলো ছিল বাঁদরের মত সরু, কিন্তু বেশ লম্বা ও খুব শক্তিশালী। তার কপাল ছিল নিচু। চোয়াল ছিল দাঁতওয়ালা বন্য পশুর মত ধারালো ও তীক্ষ্ণ। শরীর ঢাকবার জন্য কোন-কিছু তার জানা ছিল না।

নিরাপদ আস্তানা এবং ছেলেমেয়েদের রক্ষা করার উপায় তারা জানত না। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে 'যাভা-মানুষ,' 'পিকিং মানুষ' ও ইংলণ্ডের 'পিল্টডাউন-মানুষ-'ই প্রাচীনযুগের মানুষ।

প্রাচীনযুগের মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ ব্যবহার না জানলেও আগুনের ব্যবহার তাদের কাছে অজানা ছিল না। তবে কি করে তারা আগুনের ব্যবহার শিখল তা ঠিকভাবে জানা যায় না। মনে হয় যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিন লক্ষ বৎসর আগে 'পিকিং-মানুষই' প্রথম আগুন জ্বালাতে শেখে। সম্ভবত কাঠে কাঠে ঘষার ফলে যে দাবানলের সৃষ্টি হয় তা দেখেই তারা আগুন জ্বালাতে শেখে। মানুষের ইতিহাসে আগুনের আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রাণিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই আগুনের ব্যবহার জানে। আগুনের ব্যবহার না জানতে পারলে মানুষের ইতিহাসও অন্য রকম হত।

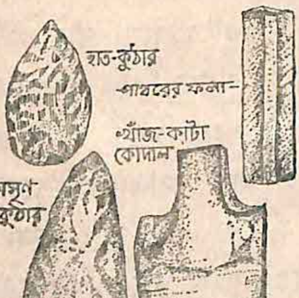
সে-যুগের মানুষ গভীর জঙ্গলে বাস করত এবং সারাদিন খাদ্য সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকত। আদিম মানুষ ক্ষুধা মেটাবার জন্য মাছ,

মাংস গাছের পাতা, ফল-ফুল ইত্যাদি যখন যা পেত তাই খেত। কখনও কখনও নিজের সন্তানদের জন্য পাখির ডিমও সংগ্রহ করত। কোনদিন হয়ত সুযোগ পেলে সে একটি পাখি বা একটি বুনো কুকুর বা খরগোশ শিকার করত। কিন্তু রান্না করে খেতে না জানার জন্য এসব পশু-পাখির কাঁচা মাংস খেয়েই সে ক্ষুধা মেটাত। আগুনের ব্যবহার জানার পরে আদিম মানুষ অবশ্য মাংস আগুনে পুড়িয়ে খেত।

● আদিম মানুষ নিজেদের জন্য খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক প্রভৃতি কিছুই তৈরি করতে জানত না। কিন্তু তারা আগুনের ব্যবহার জানত।

খ. ২য় পাঠ : প্রাচীন প্রস্তর যুগ, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস, ব্যবহার

আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের জন্যে আদিম যুগের মানুষ ধীরে ধীরে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে শুরু করে। অস্ত্রগুলো ছিল অসমান ও অমসৃণ। এইযুগের মানুষ প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ নামে পরিচিত। প্রথম দিকে মানুষ হাতের কাছে গাছের ডাল বা পাথর যা পেত তাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। ক্রমে ক্রমে তারা বুঝতে পারল যে, অস্ত্রগুলো একটু মসৃণ ও ধারালো হলে আঘাত করার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। তবে পাথরের অস্ত্র ব্যবহারের আগে তারা সম্ভবত মৃত জীবজন্তুর হাড় ও কাঠ দিয়ে অস্ত্র তৈরি করত। অস্ত্র তৈরি করতে হাড়, কাঠ বা পাথর যাই লাগুক না কেন, অস্ত্র তৈরির ফলেই মানুষের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। নিয়মিত নানাধরনের অস্ত্র তৈরি করতে করতে মানুষ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করার কৌশল আবিষ্কার করে। এই ধরনের নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা কেবল সেই প্রাচীন



প্রাচীন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

যুগের মানুষের মধ্যেই নয় বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই।

বিভিন্ন স্থানে এই যুগের ছোট-বড় নানাধরনের অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। তবে এইসব অস্ত্রশস্ত্র মানুষের তৈরি, অথবা প্রাকৃতিক কারণে পাথর ক্ষয়ে অস্ত্রের আকার ধরেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বর্তমানকালে অনেকে এই সব অস্ত্রশস্ত্রের কতকগুলোকে মানুষের তৈরি বলেই মনে করেন।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ শীত ও গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য গাছের ছাল বা পশুর চামড়ার পোশাক ব্যবহার শুরু করে। পশু শিকারের জন্য সে মাটি গর্ত করে ফাঁদ তৈরির কৌশল আবিষ্কার করে। তারপর ফাঁদে-পড়া বন্যপশু ভারী পাথর দিয়ে মেরে তাদের চামড়া থেকে নিজেদের পোশাক তৈরি করত। সে নিজের জন্য নিরাপদে থাকার জায়গার ব্যবস্থাও করে। অনেক পশুই তখন গুহায় বাস করত। মানুষ গুহা থেকে সেসব পশুদের তাড়িয়ে নিজেরা সেখানে বাস করতে শুরু করে। বড় ও ভারী পাথর দিয়ে গুহার প্রবেশের মুখ বন্ধ করে গুহাগুলোকে সে আরও নিরাপদ করে তোলে। আগুনে ঝলসে নিয়ে মাংস খাওয়া ও রান্না-করা-খাদ্যের ব্যবহার সম্ভবত এই যুগেই মানুষ প্রথম শেখে।

● প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে শেখে। নিজেদের জন্য পোশাক ও নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। কাঁচা মাংস প্রভৃতির বদলে রান্না-করা খাদ্য খেতে শেখে।

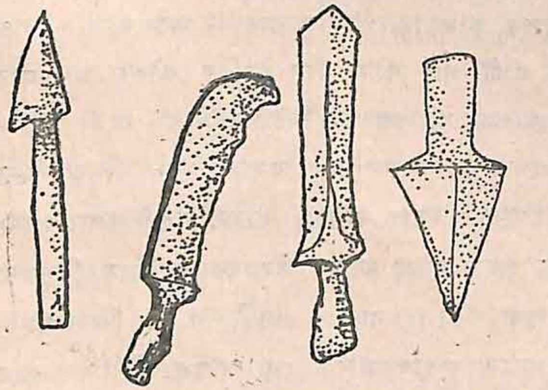
গ. নব্য-প্রস্তর যুগ (যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আট হাজার বৎসর আগে)

৩য় পাঠ : **উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি**

সভ্যতার বিকাশে নব্যপ্রস্তর যুগের গুরুত্ব অন্য যে-কোন যুগের চেয়ে অনেক বেশি। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের প্রধান কাজই ছিল বাঁচবার জন্য যে-কোন ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষ তার পূর্ব-পুরুষের সেই পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার জীবন চালাতে শুরু করে। এই যুগেই মানুষ পশুপালন ও

চাষবাস আরম্ভ করে। নব্য-প্রস্তর যুগের সভ্যতা প্রথম কোথায় গড়ে ওঠে সে-কথা ঠিকভাবে বলা একেবারেই অসম্ভব। তবে ধীরে ধীরে এই সভ্যতা প্রাচীন প্রস্তর যুগের সভ্যতা যেসব জায়গায় গড়ে উঠেছিল সেসব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি জাপান ও আমেরিকার মত নতুন নতুন অঞ্চলেও ওই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের তুলনায় নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষ অনেক উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত। তারা মসৃণ ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। কাঠের হাতলওয়ালা কুড়ুল এই যুগের অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। পরের দিকে কাঠকাটার চেয়েও যুদ্ধ বা কোন শিকারের সময় এই কুড়ুলের ব্যবহার বিশেষভাবে বেড়ে যায়।



নব্য-প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

এই যুগের তৈরি তীরের শাণিত ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগও বিভিন্নস্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। তবে এই যুগে নতুন ধরনের অস্ত্রের পাশাপাশি পুরনো দিনের অস্ত্রেরও অনেক প্রচলন ছিল। কিন্তু নব্য-প্রস্তর যুগের মসৃণ অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে প্রাচীন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

৪র্থ পাঠ: কৃষিকাজ ও খাদ্যদ্রব্য

নব্য-প্রস্তর যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কৃষিকাজ। কোথায় এবং কিভাবে প্রথম চাষবাসের কাজ আরম্ভ হয় তা বলা সম্ভব নয়। তবে সম্ভবত ইয়োরোপে এর প্রথম শুরু হয় এবং পরে পশ্চিম-এশিয়ায় চাষবাসের কাজ ছড়িয়ে পড়ে। কৃষিকাজ এই যুগে আরম্ভ হলেও খাদ্য-সংগ্রহের জন্য তখনও পশুশিকারের উপরই মানুষ বেশি নির্ভর করত।

পুরুষ মানুষ যখন বনে বনে পশু শিকার করে বেড়াত, মেয়েরা সাধারণত চাষবাসের দেখাশুনা করত। ফল-মূল এবং পশু-মাংসই এই যুগের মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল। গরু ও ছাগলের দুধ থেকে মেয়েরা দই, পনীর, মাখন তৈরি করত। খাদ্যশস্য পেষাই করার জন্য পাথরের যাঁতার ব্যবহার হত। তারা রুটি তৈরি করতেও জানত। খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে রাখবার জন্য তারা বেত বা বাঁশের ঝুড়ি ও মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করত। ঝুড়িতে মাটি লেপে রুটি সেঁকার বাসন তৈরি হত।

৫ম পাঠ : পশুপালন

চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের মানুষ পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। কুকুরই মানুষের প্রথম গৃহপালিত পশু। নির্দিষ্ট ভাবে না বলা গেলেও এশিয়াতেই বুনো পশু ও পাখিকে প্রথম পোষ মানানো হয়। ধীরে ধীরে গরু, ভেড়া, ছাগল, শুয়োর, রাজহাঁস, হাঁস ও মৌমাছি মানুষের পোষ মানে। খাদ্যশস্য ও ফল-মূলের মত গৃহপালিত পশুও মানুষের খাদ্যের যোগান দিত।

৬ষ্ঠ পাঠ : মাটির বাসনপত্র তৈরির-পদ্ধতি, চাকা আবিষ্কার

মানুষ এই যুগে পোড়ামাটির বিভিন্ন ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বাসনপত্র তৈরি করার উপায় আবিষ্কার করে। বিভিন্ন স্থানে মাটির নিচে বর্তমানে তার অনেক সুন্দর সুন্দর নমুনা খুঁজে পাওয়া গেছে। মাটির বাসনপত্র তৈরির জন্য কুমোরের চাকের ব্যবহারও এই সময় থেকে শুরু হয়। চাকা আবিষ্কার এই যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চাকার সাহায্যে গরুর গাড়িতে করে ভারী জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো সম্ভব হয়। পরের যুগে মানুষের ইতিহাসে চাকার গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। জমি চাষ করার জন্য লাঙ্গলের ব্যবহারও এই যুগেই প্রথম দেখা যায়।

৭ম পাঠ : কাপড় বোনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাসস্থান

কাপড় বোনা—নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষই প্রথম সুতা কাটা ও কাপড়

বোনার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এশিয়ার পূর্ব অঞ্চলে সম্ভবত চীন বা ভারতে কাপড় তৈরির পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। কাপড় বোনার জন্য তারা তূলা ও পশমের ব্যবহার জানত। এতদিনে মানুষ শীত ও রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করতে পারল।

যোগাযোগ ব্যবস্থা—প্রথম যুগের শিকারী ও যাযাবর মানবগোষ্ঠী সংখ্যায় খুব অল্প ছিল। তাদের অভাবও ছিল খুব কম। অন্যের উপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজন তাদের ছিল না। জীবনের প্রয়োজনীয় সব-কিছু তারা নিজেরাই তৈরি করে নিত। চাষবাস, কাপড়বোনা, বাসনপত্র তৈরি প্রভৃতির পর তারা একটা জায়গায় স্থায়িভাবে বাস করতে শেখে। একটা নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়িভাবে বাস করার জন্য তাদের অপরের উপর নির্ভর করার দরকার হয়ে পড়ে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জিনিসপত্রের আদানপ্রদানের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাচীন প্রস্তর যুগে গাছের গুঁড়ি দিয়ে নৌকা তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও নব্য-প্রস্তর যুগেই যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নৌকার গুরুত্ব ক্রমে বেড়ে যেতে থাকে। একই কারণে চাকা-লাগানো গরুর গাড়ির সংখ্যাও ধীরে ধীরে অনেক বেড়ে যায়।

স্থায়ী বাসস্থান—কৃষিকাজ ও পশুপালন নব্য-প্রস্তর যুগের সামাজিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। সারাদিন পশুশিকারে ব্যস্ত না থাকায় মানুষ এখন অলসভাবে সময় কাটাবার সুযোগ পায়। ফলে তাদের জীবনে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। লোকসংখ্যাও দ্রুত বেড়ে যায়। নব্য-প্রস্তর যুগের শেষে পাথরের ঘরবাড়ি তৈরি করা শুরু হয়। আত্মরক্ষার জন্য ঘরবাড়ির চারদিকে পাথরের দেওয়ালও দেওয়া হত। পুরনো আমলের সরলভাবে জীবন কাটাবার দিন শেষ হয়ে যায়। এই সময় থেকেই ছোট ছোট গ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে মানুষের সামাজিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে।

৮ম পাঠঃ ধর্ম, শিল্পকলা ও ভাষা

ধর্ম ও শিল্পকলা—নব্য-প্রস্তর যুগে ধর্মেরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। প্রাচীন যুগের যাদুবিদ্যা, সাপ, গাছ ইত্যাদির পূজা ও ঈশ্বরের আরাধনা প্রভৃতির কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়। চাষবাসের প্রচলনের ফলে মাটির সঙ্গে মানুষের নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং প্রকৃতির ঋতুপরিবর্তন তাদের কাছে একটি বিস্ময় হিসেবে দেখা দেয়। চাষের জমিকে তারা এক বিরাট ক্ষমতাসম্পন্ন মাতৃদেবী বলে কল্পনা করতে শুরু করে। এই মাতৃদেবীই শস্য, শস্যক্ষেত্র,গৃহপালিত ও বন্যপশু—সব-কিছুরই সৃষ্টির দেবীর সম্মান পান। মাতৃদেবীকে কেন্দ্র করে অনেক অলৌকিক ও পৌরাণিক গল্পের প্রচলন হয়। পরবর্তী যুগের মিশর, সুমেরু ও আনাতোলিয়ার ধর্মচিন্তায় এই মাতৃদেবীর গভীর প্রভাব দেখা যায়।

ধর্ম নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের শিল্পকলার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন গুহাচিত্রে এবং বাসনপত্র, বেত ও মাটির ঝুড়িতে এই সময়ের শিল্পকলার সুন্দর সুন্দর নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। এই যুগের গুহাচিত্রে তখনকার মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাষা—চিৎকারের সঙ্গে নানা অঙ্গভঙ্গি করে মানুষ তার মনোভাব প্রকাশ করত। নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষ প্রথম ভাষা ব্যবহার শুরু করে। প্রথম দিকে মানুষ তাড়াতাড়ি কতকগুলো অস্পষ্ট কথা উচ্চারণ করত। ভয় ও বিপদের সময়ই ছিল এই ভাষার বিশেষ ব্যবহার। ধীরে ধীরে ওই সব কথা একটা স্পষ্ট রূপ ধরে। বিশেষ কোন মনোভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ বিশেষ কোন শব্দ ব্যবহার করত। এইসব শব্দগুলোই ক্রমে ক্রমে ভাষা হিসেবে রূপ পায়।

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে প্রাচীন ও নব্য-প্রস্তর যুগের লোকের দান খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত কম হলেও এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাদের উপর নির্ভর করেই পরবর্তী যুগের সভ্যতার কাঠামো গড়ে উঠেছে। জীবিকার

জন্য পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই এখনও পশুপালন ও কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে আছে। চাকার ব্যবহার না জানলে আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠা একেবারেই অসম্ভব ছিল। আধুনিক সভ্যতার প্রতিটি দিকেই প্রাচীন ও নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের প্রভাব সুস্পষ্ট।

● ১। নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষ চাষবাস, পশুপালন, মাটির বাসনপত্র তৈরি করতে শেখে।

২। এই যুগেই চাকা আবিষ্কার হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়। এই যুগের মানুষই প্রথম কাপড় বুনতে শেখে।

৩। এই যুগেই মানুষ স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করে। নব্য-প্রস্তর যুগে ধর্ম ও ভাষার উৎপত্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অনুশীলনী

১। আদিম যুগের মানুষ দেখতে কেমন ছিল?

২। মানুষ কিভাবে আগুনের ব্যবহার শেখে?

৩। প্রাচীনযুগের মানুষ কিভাবে খাদ্য সংগ্রহ করত?

৪। প্রাচীন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রের একটি বিবরণ দাও।

৫। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ কিভাবে নিজেদের বাসস্থান ও পোশাক তৈরির ব্যবস্থা করে?

৬। মানুষের ইতিহাসে প্রাচীন প্রস্তর যুগের গুরুত্ব কি?

৭। নব্য-প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রের একটি বিবরণ দাও।

৮। নব্য-প্রস্তর যুগের কৃষিকাজ সম্বন্ধে কি জান?

৯। নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের পশুপালন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১০। নব্য-প্রস্তর যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থা কি রকম ছিল?

১১। নব্য-প্রস্তর যুগে স্থায়ী বাসস্থান গড়ে ওঠার কারণ কি?

১২। নব্য-প্রস্তর যুগে কিভাবে ধর্ম-বিশ্বাস গড়ে ওঠে?

১৩। কিভাবে মানুষের ভাষা সৃষ্টি হয়?

১৪। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে নব্য-প্রস্তর যুগের গুরুত্ব কি?

১৫। কাপড় বোনার পদ্ধতি কোথায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়? কি দিয়ে তারা কাপড় বুনত?

১৬। সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ কোথায় বাস করত ?

(খ) 'পিকিং-মানুষ' কোন্ যুগে বাস করত ?

(গ) প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ কিভাবে পশু শিকার করত ?

(ঘ) প্রথমে কোন্ কোন্ প্রাণী মানুষের পোষ মানে ?

(ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মানুষ প্রথম কি কি ব্যবহার করত ?

১৭। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) নব্য-প্রস্তর যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য — ।

(খ) — মানুষের প্রথম গৃহপালিত পশু।

(গ) কাপড় বোনার জন্য তারা — ও — ব্যবহার জানত।

(ঘ) পরের যুগে মানুষের ইতিহাসে — ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে।

(ঙ) এইসব শব্দগুলোই ক্রমে ক্রমে — হিসেবে রূপ পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

চাষবাস, পশুপালন ও ছোট ছোট যন্ত্র তৈরির কাজে অভিজ্ঞ হয়ে নব্য-প্রস্তর যুগের শেষ দিকে মানুষ অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্র ও অলঙ্কার তৈরির জন্য ধাতুর ব্যবহার শুরু করে। নানা পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে যেমন নব্য-প্রস্তর যুগে, তেমনি নব্য-প্রস্তর যুগও ধীরে ধীরে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে এল। এইসব যুগ-পরিবর্তনের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। তবে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে এমন কি লৌহ যুগেও অস্ত্রশস্ত্র তৈরির জন্য পাথরের ব্যবহার হত সমানভাবেই।

মানব-সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে ধাতুর আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম ধাতু সোনার বিশেষ গুরুত্ব নেই। প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর দু-পাশেই প্রচুর সোনা পাওয়া যেত। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের মানুষ প্রচুর সোনা সংগ্রহও করেছিল।

সেকালে রূপাও প্রচুর পাওয়া যেত। সোনা ও রূপা দুটি ধাতুই অলঙ্কার তৈরির জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সোনা ও রূপার ব্যবহার যথেষ্ট বেড়ে যায়।

কিন্তু সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে সোনা ও রূপার চেয়ে তামার দাম অনেক বেশি। স্পেন, সাইপ্রাস, সিনাই উপদ্বীপ, আর্মেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর তামা পাওয়া যেত। অস্ত্রশস্ত্র ও ছোট ছোট যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য তামার যথেষ্ট চাহিদা ছিল।

তাম্র যুগের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রোঞ্জ যুগের শুরু হয়। ধাতুর কারিগররা তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরির কৌশল আবিষ্কার করে। ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে কঠিন ধাতু এবং ব্রোঞ্জের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রও বেশি মজবুত হয়।

১ম পাঠ : শহরের সৃষ্টি, উৎপাদন-রীতির পরিবর্তন

নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতা—টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, নীল, সিন্ধু ও হোয়াং হো নদীর পাশের অঞ্চলে এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়। এইসব সভ্যতা ধীরে ধীরে উত্তর ও পশ্চিমের অনেক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তিন হাজার খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ক্রীট দ্বীপেও তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এই যুগের সভ্যতা সাধারণভাবে শহরকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল। এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ও ট্রয় নগরীতেও এই যুগে এক উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়। ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র তৈরি ও যোগানের ব্যাপারে ট্রয় নগরীর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই যুগের সভ্যতা সাধারণভাবে নদীর উপর নির্ভর করত। শহরগুলিকে রক্ষার জন্য অনেক সময় তাদের চারদিকে ছোট ছোট খাল কাটা হত। ব্যাবিলন, মিশর, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, আনিংয়াং প্রভৃতি জায়গায় এই যুগের নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যায়।

উৎপাদন রীতির পরিবর্তন : তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের প্রথম দিকে পুরনো আমলের পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত। হাড়ের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। খাদ্যশস্য, দুধ ও পনীর মজুত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র তৈরি হত। তবে

এই যুগে যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য ব্রোঞ্জের ব্যবহার বেড়ে যায়। ব্রোঞ্জের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের আকৃতি ও অলঙ্করণেরও অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্রোঞ্জের তরোয়াল, ছোরা, ঢাল, ছুরি, করাত, কাস্তে, ব্রোচ, বালা, আলপিন, কুড়ুল, রণভেরী, কারুকার্যকরা পাত্র ইত্যাদির মধ্যে সেকালের কারিগরদের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম-ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে এইসব শিল্পের অনেক নমুনা পাওয়া গেছে। তবে ডেনমার্কে পাওয়া এই ধরনের শিল্পের নমুনাই সবচেয়ে সুন্দর।

২য় পাঠ : ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক জীবনের পরিবর্তন, শ্রেণীর সৃষ্টি, উপজাতির মধ্যে যুদ্ধ, রাজ্যের প্রাথমিক উৎপত্তি

ব্যবসা-বাণিজ্য—নব্য-প্রস্তর যুগের তুলনায় তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হয়। মেসোপোটামিয়া ও মিশরে খোরাশান, স্পেন ও আয়ারল্যাণ্ড থেকে তামা এবং কর্নওয়াল ও স্পেন থেকে টিন আমদানি করা হত। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিময়-প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তবে কখনও কখনও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মুদ্রার বদলে ব্রোঞ্জ প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর ব্যবহার করা হত। এসময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যর জন্য অনেক নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হয়। গরু, ঘোড়া, হাতি প্রভৃতি জন্তুর সাহায্যে মালপত্র দূর দূর অঞ্চলে পাঠানো হত। বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে ওঠার ফলে কয়েকটি নতুন বাণিজ্য-পথের সৃষ্টি হয়। মধ্য-এশিয়া, এশিয়া মাইনর ও চীনের উত্তর অঞ্চলের এই সব বাণিজ্য-পথের কয়েকটি বর্তমান যুগেও যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সামাজিক জীবনের পরিবর্তন ইত্যাদি—লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। চাষবাস ও পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়িয়ে তোলার দিকে মানুষের আগ্রহ দেখা দেয়। ফলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণের পার্থক্য বেড়ে যায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও জীবিকার পার্থক্যের জন্য মানুষের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

জমির উর্বরতা বা প্রাকৃতিক কারণে কোন কোন অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল থেকে তাড়াতাড়ি উন্নত হয়ে উঠতে থাকে। অনেক সময় এই অর্থনৈতিক উন্নতিই বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যুদ্ধের কারণ হয়ে দেখা দেয়। জনবহুল ও সমৃদ্ধ অঞ্চলও মাঝেমাঝে পাশের অঞ্চলের উপর অধিকার স্থাপনের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। কোন কোন অঞ্চলের সমৃদ্ধিও পাশের অঞ্চলের লোকদের আক্রমণের একটি প্রধান কারণ।

শক্তিশালী উপজাতিগুলোর অন্যান্য দুর্বল উপজাতির উপর কর্তৃত্বের আগ্রহ থেকেই ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে রাজ্যের প্রধানদের দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে বসিয়ে রাজার শক্তিকে আরও শক্তিশালী ও স্থায়ী করে তোলার চেষ্টা হয়।

৩য় পাঠ : নদীর তীরের অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ

প্রাচীনকালের সভ্যতার অনেকখানিই নদীর দান। নদীর দু'পাশের অঞ্চল সাধারণত উর্বর। নদীর জলে বয়ে-আনা পলিমাটি এই সব অঞ্চলের জমিকে আরও উর্বর করে তোলে। উর্বরতার জন্য গৃহপালিত পশুর খাদ্যেরও কোন অভাব হত না, আর প্রচুর খাদ্যশস্য জন্মাত খুব সহজেই। বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থায় নদী খুব সাহায্য করে। প্রাচীনকালে যখন অন্য-কোন ধরনের যানবাহন আবিষ্কৃত হয়নি, তখন নদী-পথে নৌকায় ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। নদী-পথে সহজেই আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করা যেত। নদী পেরিয়ে আসা বিদেশী আক্রমণকারীদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য কাজ ছিল বলেও নদীর তীরে সাধারণত রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করা হত। সহজে পানীয় জল পাওয়াও প্রাচীন কালের লোকের একটি বিরাট সমস্যা ছিল। কিন্তু নদীর তীরের অঞ্চলের জনসাধারণের পানীয় জলের কোন সমস্যা ছিল না। এইসব কারণে নীল, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, সিন্ধু, হোয়াং হো প্রভৃতি নদীর তীরেই প্রাচীনকালে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

● ১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের মানুষ ধাতুর বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে শেখে। ফলে উৎপাদনে পরিবর্তন দেখা দেয়। নদীর তীরে শহরের সৃষ্টি হয়।

২। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবর্তন হয়। মূল্যবান ধাতু ও মুদ্রার বদলে জিনিসপত্রের কেনাবেচা শুরু হয়। সামাজিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী ও রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

৩। সহজ যোগাযোগ, পানীয় জলের সুবিধা, জমির উর্বরতার জন্য নদীর তীরে প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে উৎপাদন রীতিতে কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

২। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে সামাজিক জীবনে কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

৩। প্রাচীনকালে নদীর তীরে কেন সভ্যতা গড়ে ওঠে?

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ধাতু আবিষ্কারের গুরুত্ব কি?

(খ) প্রাচীনকালে কোথায় কোথায় তামা ও টিন পাওয়া যেত?

(গ) ব্রোঞ্জ দিয়ে কি কি তৈরি হত?

(ঘ) কি করে প্রাচীনকালে রাজ্য গড়ে ওঠে?

(ঙ) প্রাচীনকালে বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে কেন সংঘর্ষ দেখা দিত?

৫। সঠিক উত্তরে '√' এই চিহ্নটি দাও :—

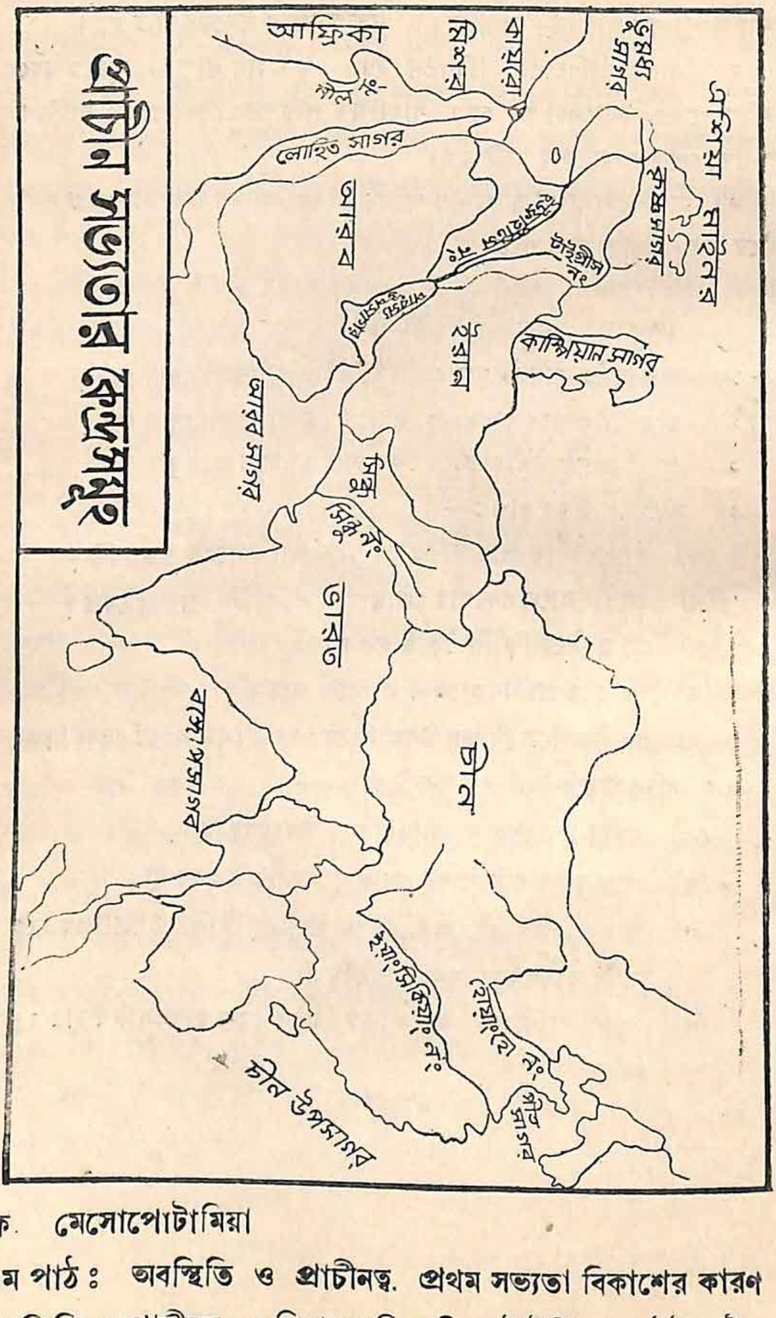
(ক) নদীর দুপাশের অঞ্চল সাধারণত উর্বর/অনুর্বর।

(খ) তাম্র-যুগের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রোঞ্জ-যুগের শুরু হয়/হয় না।

(গ) অনেক সময় এই অর্থনৈতিক উন্নতিই বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যুদ্ধের কারণ হয়ে দেখা দেয়/দেয় না।

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনেক নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হয়/হয় না।

প্রাচীন সভ্যতা (৩০০০—১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ)



ক. মেসোপোটামিয়া

১ম পাঠ : অবস্থিতি ও প্রাচীনত্ব. প্রথম সভ্যতা বিকাশের কারণ

অবস্থিতি ও প্রাচীনত্ব—এশিয়ার পশ্চিম দিকে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস

নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলের নাম মেসোপোটামিয়া বা ব্যাবিলোনিয়া। গ্রীক ভাষায় মেসোপোটামিয়া শব্দের অর্থ দুটি নদীর মাঝামাঝি জায়গা বা দোয়াব অঞ্চল। এজন্য গ্রীকরা এই দেশের নাম রাখে মেসোপোটামিয়া। আমরা এই দেশকে এখন ইরাক বলি।



এই অঞ্চলের উত্তর দিকের নাম আক্কাদ ও দক্ষিণ দিকের নাম সুমের। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটি যেখানে মিলেছে তার নিচের অঞ্চলের নাম ক্যালডিয়া। আক্কাদ, সুমের ও ক্যালডিয়া নিয়েই প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া। ব্যাবিলোনিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে ছিল ইলাম ও উত্তরে আসিরিয়া। মেসোপোটামিয়ায় অনেকগুলো নগর-রাষ্ট্র ছিল। এদের মধ্যে আক্কাদের আগাদে, ওপিশ, কিনা, কুথা, ব্যাবিলন, বরসিপ্পা ও সিপ্পার; সুমেরের আদাব, এবেক, এরিডু, উর, উম্মা ও লাগারের নাম বিখ্যাত। আক্কাদ ও সুমেরের নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। এদের যুদ্ধের ইতিহাসই প্রাচীন মেসোপোটামিয়ার ইতিহাস।

ব্যাবিলোনিয়ায় যে-সব জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির নমুনা পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে সুমেরীয় জাতিই সব থেকে প্রাচীন। যিশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চারহাজার বছর আগে সুমেরীয় জাতি ব্যাবিলোনিয়ায়

প্রবেশ করে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অল্পদিনের মধ্যেই সুমেরীয় জাতি এই অঞ্চলে একটি উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করে। দু হাজার ন শ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আরব অঞ্চলের সেমেটিক জাতির একটি দল সুমেরীয়দের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে মেসোপোটামিয়া অধিকার করে। পরে তারা স্থায়িভাবে আক্কাদে বসবাস করতে শুরু করে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তারা সুমেরীয়দের সমান ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা সুমেরীয় সভ্যতাই মেনে নেয়। ফলে জাতি হিসেবে সুমেরীয়রা ধ্বংস হলেও তাদের সভ্যতা কিন্তু আরও অনেকদিন ধরে বেঁচে থাকে।

প্রথম সভ্যতা বিকাশের কারণ—পশ্চিম এশিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলই মরুভূমি, অনুর্বর এবং মানুষের বসবাসের উপযুক্ত নয়। কিন্তু মেসোপোটামিয়া একেবারে অন্য রকম। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর বয়ে-আনা পলিমাটির জন্য মেসোপোটামিয়ার জমিগুলো ছিল অত্যন্ত উর্বর। অল্প পরিশ্রমেই এখানে প্রচুর ফসল ফলানো যেত। গৃহপালিত পশুদের জন্য এখানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস পাওয়া যেত। নদীর তীরের অঞ্চল বলে এখানে সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে ওঠে। প্রাচীন কালে যেখানে বছরের সবসময়ই জল পাওয়া যেত সেখানেই সভ্যতা গড়ে উঠত। মানুষের জীবনে প্রয়োজন হয় পানীয় জল, প্রচুর খাদ্য. বাসস্থান তৈরির দরকারী জিনিসপত্র, পশুদের চরবার জমি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা। মেসোপোটামিয়ায় এর কোনটারই অভাব ছিল না। ফলে এই অঞ্চলে প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক।

● ১। এশিয়ার পশ্চিম দিকে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝামাঝি জায়গার নাম মেসোপোটামিয়া বা ব্যাবিলোনিয়া।

২। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বৎসর আগে সুমেরীয় জাতি ব্যাবিলোনিয়ার সভ্যতা গড়ে তোলে।

৩। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরের অঞ্চল বলে এই জায়গা ছিল অত্যন্ত উর্বর। মানুষের জীবনে যা যা প্রয়োজন হত তা সহজেই এখানে পাওয়া যেত। সেজন্যই এখানে প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠে।

S.C.E.R.T., West Bengal
Date....6.7.89
Acc. No....4493

২য় পাঠ : জমির উর্বরতা, শস্য, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ

জমির উর্বরতা, শস্য—সুমেরীয়রা আসার আগে থেকেই মেসোপোটামিয়ার কৃষি যথেষ্ট উন্নত ছিল। এই অঞ্চলের প্রাচীন লোকেরাই বন্যার হাত থেকে নিজেদের জমি ও বাসস্থান রক্ষা করার জন্য খাল কাটে ও বাঁধ তৈরি করে। সুমেরীয়রা আসার পর কৃষিকাজের আরও উন্নতি হয়। সুমেরীয় লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিল। তারা চাষবাসের ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন করে। জমিতে জলসেচের জন্য নতুন নতুন অনেক খাল কাটা হয়। প্রয়োজন হলে নদীতে বাঁধ দিয়েও জলসেচের ব্যবস্থা করা হত। জলসেচের ফলেই জমিতে শস্যের ফলন অনেক বেড়ে যায়। জমি চাষের জন্য সুমেরীয়রা নব্য-প্রস্তর যুগে আবিষ্কৃত এক ধরনের লম্বা বাঁট ওয়ালা কোদাল ব্যবহার করত। তবে প্রয়োজনে এই কোদালেরও তারা কিছু কিছু বদল করে। বীজ বোনারও এক নতুন পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করে। মেসোপোটামিয়ায় প্রচুর গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত। ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে এই অঞ্চলে যে বীজ বোনা হত তার দু শ গুণ বেশি ফসল হত। প্লিনি বলেছেন যে, এখানে দুবার ফসল কাটা হত এবং শুকনো খড়গুলো গৃহপালিত পশুদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত। সুমেরীয়রা নানাধরনের খাদ্যশস্য ও শাকসব্জি খেত। খেজুর ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। গৃহপালিত পশুর দুধ থেকেও তারা নানাধরনের খাবার তৈরি করত। মেসোপোটামিয়ার লোকেরা মধু খেতে ভালবাসত। ছাগল, শুয়োর, ভেড়া, গরু, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির কোন অভাব ছিল না। খাদ্যের প্রাচুর্যের জন্যই শহরকে কেন্দ্র করে এখানে অনেকগুলো নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

বন্যা-নিয়ন্ত্রণ—টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীতে প্রতি বৎসরই বর্ষাকালে বন্যা দেখা দিত। বন্যার হাত থেকে নিজেদের বাড়িঘর ও চাষের জমি বাঁচাবার জন্য মেসোপোটামিয়ার লোকেরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়। নদীর পাড়ে বাঁধ দিয়ে তারা বন্যার সময় উপচে-পড়া জল আটকে রাখার চেষ্টা করে। বিভিন্ন জায়গায় খাল কেটেও নদীর

বাড়তি জল দেশের অন্যান্য স্থানে বইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই সব পুরনো বাঁধ ও খালের চিহ্ন বর্তমান কালেও মেসোপোটামিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়।

বন্যা মাঝেমাঝে সুমের ও আক্কাদের অনেক ক্ষতি করলেও মেসোপোটামিয়ার লোকের কাছে কিন্তু বন্যা ছিল আশীর্বাদ। বন্যার জল প্রচুর পলিমাটি বয়ে আনত। যার জন্য জমির উর্বরতা বেড়ে যেত এবং শস্যের ফলনও অনেক বেশি হত।

● ১। সুমেরীয়রা খাল কেটে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করত। ফলে জমির উর্বরতা অনেক বেড়ে যেত এবং ফসলও ফলত অনেক বেশি।

২। বীজ বোনার নতুন এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করে। মেসোপোটামিয়ায় প্রচুর গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য হত।

৩। এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর।

৪। নদীর তীরে বাঁধ দিয়ে এবং খাল কেটে তারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করত।

৩য় পাঠ : নানা ধরনের কাজকর্ম

মেসোপোটামিয়ার লোকের প্রধান জীবিকা ছিল চাষবাস। তবে বহুলোক ব্যবসা-বাণিজ্যও করত। পুরনো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ব্যবসার চিঠিপত্র, রসিদ, বিক্রয়ের বিল, ঋণ-পত্র, মূলধন ও সুদের হিসাবের কাগজ-পত্র পাওয়া গেছে। এই সব নমুনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, দেশের বহুলোক খাদ্য-শস্য ও শিল্প-দ্রব্যের ব্যবসা করত।

রোদে-পোড়া ইট দিয়ে মন্দির, বাড়িঘর, প্রাচীর ও রাজপথ তৈরি হত। প্রত্যেক শহরেই কমপক্ষে একটি করে মন্দির থাকত। এই সব মন্দিরের মধ্যে নিপ্পুরের সুমেরীয়দের প্রধান দেবতা এনলিলের মন্দিরটি খুব বিখ্যাত। বাড়িঘর, মন্দির ইত্যাদি তৈরির জন্য বহু লোকের প্রয়োজন হত। তাদের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যও অত্যন্ত উন্নত ছিল। বহু দক্ষ শিল্পী এবং যোগানদারেরা তাদের জীবিকার জন্য এই সব কাজের উপর নির্ভর করত। সোনা-রূপা ও অন্যান্য

ধাতু দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর বাসনপত্র ও নানা শৌখিন জিনিসপত্র তৈরি হত। বেশ কিছু লোক ধাতু-শিল্পের উপর নির্ভর করত। সুমেরের অর্থনৈতিক জীবনে পুরোহিতদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল প্রত্যেকটি মন্দিরেরও অনেক বিষয়সম্পত্তি ছিল। অনেক লোক এই সব সম্পত্তি দেখাশুনার কাজ করত এবং এটাই ছিল তাদের জীবিকা।

সুমেরের লোকদের জীবনে যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবসময় যুদ্ধ লেগে থাকত। ফলে সৈন্য হিসেবে অনেকেই জীবিকার উপায় খুঁজে পেত। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগানের জন্যও একদল বিশেষ ধরনের ব্যবসায়ীর প্রয়োজন হত।

● ১। মেসোপোটামিয়ার লোকের প্রধান কাজ ছিল চাষবাস। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যও করত।

২। কেউ কেউ ঘরবাড়ি ও মন্দির তৈরির কাজ করত।

৩। অনেকে ভাস্কর্য ও ধাতুশিল্পের উপর নির্ভর করত।

৪। অনেকে সৈনিকের কাজ করত এবং কেউ কেউ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান দিত।

৪র্থ পাঠ : সুমেরীয়দের নানা কৃতিত্ব

মন্দির ও বুরুজ—মন্দির তৈরির কাজে সুমেরীয়রা বিশেষ দক্ষ ছিল। এদের পূর্বপুরুষ পাহাড় অঞ্চলে বাস করত। পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে তারা পূজা করত। পরে সমতল অঞ্চলে বসবাস করার সময় তারা পুরনো প্রথার কিছু বদল করে। নকল পাহাড় তৈরি করে তার চূড়ায় তারা দেবতাদের আসন বসাত। সুমেরীয়দের প্রচুর দেব-দেবী ছিল। প্রত্যেক শহরে অন্তত এক একজন করে বিশেষ দেবতা এবং দেবতাদের জন্য মন্দির থাকত। এক একটি মন্দিরে একসঙ্গে অনেক দেবতাও থাকত। প্রত্যেক মন্দিরের পাশেই একটি করে সুন্দর বুরুজ তৈরি করা হত। এই সব মন্দির ও বুরুজ রোদে-পোড়া ইট দিয়ে তৈরি হত। সুমেরীয়রা সিঁড়ি বানাতে

জানত না। মন্দির ও বুরুজের চূড়া ধাপে ধাপে ছোট হয়ে শেষে উঁচুতে উঠে যেত।

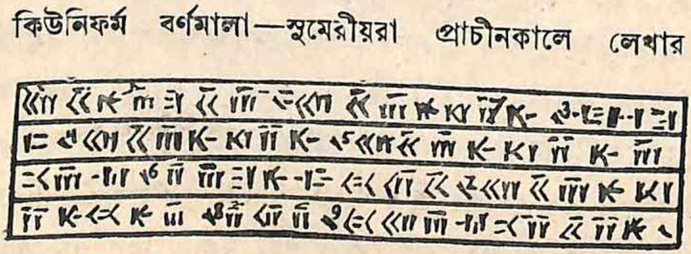
শিল্প—স্থাপত্য-শিল্পে সুমেরীয়রা যথেষ্ট দক্ষ ছিল। মন্দির ও বুরুজের ধ্বংসাবশেষ আজও তার পরিচয় দেয়। পরে গ্রীস ও রোমের লোকেরাও তাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ধরন অনুকরণ করে। ধাতু ও পাথরের কাজেও তাদের বিশেষ নিপুণতা ছিল। শিল্পীরা সোনা ও রুপো দিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র বানাত। সুমেরীয়দের তৈরি কারুকার্য-করা মাটি ও পাথরের পাত্র, পেয়ালা প্রভৃতি আজও সকলকে মুগ্ধ করে। মন্দিরের গায়ে আঁকা বিভিন্ন ছবিতেও তাদের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।



চিত্রিত বাসন

ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা—টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস নদী ও পারস্য উপসাগরের উপর নির্ভর করে মেসোপোটামিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত বেড়ে যায়। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল নদী-পথেই। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গেও সম্ভবত তাদের বাণিজ্য চলত। যোগাযোগ-ব্যবস্থার জন্য নৌকার প্রচলন ছিল। স্থলপথে বাণিজ্যের জন্য পশুদের টানা নানা রকমের গাড়ি ব্যবহার করা হত। প্রথম দিকে রাস্তা তৈরির ব্যাপারে তাদের বিশেষ কোন পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু পরে তারা সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে রাস্তা-ঘাট তৈরি করে।

কিউনিফর্ম বর্ণমালা—সুমেরীয়রা প্রাচীনকালে লেখার যে



কিউনিফর্ম বর্ণমালা

পদ্ধতি আবিষ্কার করে তা থেকেই পরে কিউনিফর্ম বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। চিত্রলিপির সাহায্যে যা লেখা হত তাই ধীরে ধীরে মুখের ভাষায় প্রকাশ পায়। কাঁচা মাটির ফলকে এই লেখা খোদাই করে পরে ফলকটিকে পুড়িয়ে স্থায়ী করা হত। ঐতিহাসিকরা সুমেরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমনি অসংখ্য লেখার ফলক আবিষ্কার করেছেন।

● ১। নকল পাহাড়ের চূড়ায় সুমেরীয়রা সুন্দর সুন্দর মন্দির ও বুরুজ তৈরি করত। তারা সিঁড়ি বানাতে জানত না।

২। স্থাপত্য ও ধাতু-শিল্পে সুমেরীয়রা নিপুণ ছিল। মন্দিরের গায়ে তারা ছবি আঁকত।

৩। জল ও স্থল দুপথেই সুমেরীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। যোগাযোগের জন্য তারা নৌকা ও পশু-টানা গাড়ির ব্যবহার করত।

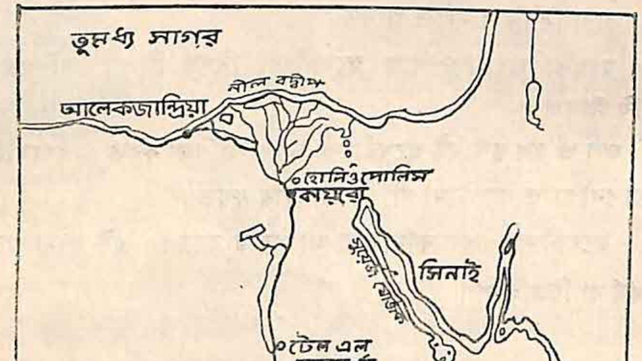
৪। সুমেরীয়রা প্রথম বর্ণমালার আবিষ্কার করে। এই বর্ণমালার নাম কিউনিফর্ম বা চিত্রলিপি।

খ. মিশর

১ম পাঠ : অবস্থান ও ভু-প্রকৃতি

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ইতিহাসে মিশরের দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দু দিকে উঁচু মরুভূমির মাঝখানে নীল নদীর পাড়ে সরু অঞ্চলে মিশরের অবস্থান। এই অঞ্চল প্রস্থে কোন কোন জায়গায় ষোল কিলোমিটার আবার কোথাও কোথাও বত্রিশ কিলোমিটার। এই সব অঞ্চলই নীল নদীর পলিমাটি দিয়ে গড়া। মিশরের উত্তর দিকের নীলনদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দেশের উত্তর ভাগের এই চওড়া অংশ মিশরের নিচু অঞ্চল নামে পরিচিত। আসওয়ান বাঁধের কাছের জলপ্রপাত থেকে শুরু করে নিচু অঞ্চলের সীমানা পর্যন্ত ভূ ভাগ মিশরের উঁচু ভূমি নামে পরিচিত। এই অঞ্চল দুটি লম্বায় প্রায় আট শ কিলোমিটার।

দু দিকের মরুভূমি মিশরকে পূর্ব ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে রেখেছে। দক্ষিণ দিকে নিউবিয়া ও ইথিয়োপিয়া এবং উত্তর-পূর্ব দিকের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও আরবের সঙ্গে মিশরের খুব সামান্য যোগাযোগ ছিল। ফলে মিশরের সভ্যতার উপর বাইরের জগতের অন্য কোন সভ্যতার প্রভাব খুবই কম। এমনি অবস্থায় মিশর তার সম্পূর্ণ নিজস্ব সভ্যতা গড়ে তোলে।



মিশরের সভ্যতাকে নীল নদীর দান বলা চলে। প্রতি বৎসরের জুন থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত নিয়মিত নীল নদীতে বন্যা দেখা দিত। এই বন্যার জলে বয়ে-আসা পলিমাটিতে মিশরের জমির উর্বরতা বেড়ে যায়। মিশরের এই উর্বর জমিতে প্রচুর খাদ্য-শস্য জন্মাত। প্রাচীন

কালের অন্য যে-কোন সভ্যদেশের চেয়ে মিশরের লোকসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। প্রচুর খাদ্যশস্য ফলনের জন্যই মিশরের পক্ষে এত বেশি লোকের খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। আর, সহজে প্রচুর খাবার জিনিস পাওয়া যেত বলেই প্রাচীনকালে নীল নদীর তীরে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

● ১। দুদিকে উঁচু মরুভূমির মাঝখানে নীল নদীর পাড়ে সরু অঞ্চলে মিশরের অবস্থান।

২। দেশের সমস্ত অংশ নীল নদীর পলিমাটি দিয়ে গড়া।

২য় পাঠ: ফারাও, পুরোহিত, লিখন-পদ্ধতি ও লেখক, রাজস্ব আদায়কারী ও সৈন্য

ফারাও—মিশরের রাজাদের ফারাও বলা হত। প্রাচীন সুমের ও আসিরিয়ায় পুরোহিতরাই দেশ শাসন করত। কিন্তু মিশরের ক্ষেত্রে তা নয়। যে-কোন পুরোহিত বা রাজার তুলনায় মিশরের ফারাওরা প্রথম থেকেই অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করতেন। তিনি জনসাধারণের কাছে দেবতার মত পূজা পেতেন।



ফারাও

নীল নদীর তীরে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে নব্য-প্রস্তর যুগে দুটি পৃথক রাজ্য গড়ে ওঠে। প্রায় চার হাজার খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মিশরের উঁচু অঞ্চলের ফারাও জেনেস ব-দ্বীপ অঞ্চল জয় করে দুই মিশরকে একটি রাজ্যে একত্রিত করেন। ব-দ্বীপ অঞ্চলের মেম্ফিস নতুন রাজধানী হয়।

মিশরে পরপর ছাব্বিশটি রাজবংশ রাজত্ব করে। কিন্তু এই সব রাজবংশের রাজত্বকালের ঠিক সময় বলা সম্ভব নয়। মিশরে সভ্যতা বিকাশের প্রথম থেকে ৫২৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে পারস্যদেশের মিশর জয়ের বৎসর পর্যন্ত এই রাজবংশগুলো মিশর শাসন করে।

মিশরের লোকেরা ফারাওকে দেবতার সন্তান বলে মনে করত। তারা বিশ্বাস করত যে, সমস্ত উদ্ভিদ্ জগত, জমির উর্বরতা ও নীল নদীর সৃষ্টিকর্তা 'ওসিরিস' দেবতার মত ফারাওর ক্ষমতাও অসীম। মিশরীয়দের প্রধান দেবতা 'রা' ছিলেন ওসিরিসের পিতা। প্রাচীন যুগের ফারাওদের মধ্যে তৃতীয় পেপী, তৃতীয় রামিসিস, তৃতীয় থটমিস ও তৃতীয় এমেনোফিসের নাম বিখ্যাত।

পুরোহিত—মিশরের ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ 'ঈশ্বর এক' এই কথা প্রচার করলেও মিশরের লোকেরা সাধারণভাবে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে বহু মন্দিরও তৈরি করা হত। এই সব মন্দিরের মধ্যে মেম্ফিসের 'টা' দেবতার মন্দির, থিবিসে 'আমন-রা' দেবতার মন্দির এবং হায়রোপোলিসের 'হোরাস' দেবতার মন্দির খুব বিখ্যাত। এই সব মন্দিরকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী একদল পুরোহিত গড়ে ওঠে। দেশের শাসন, অর্থনীতি এবং সমাজের উপরও তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মন্দিরগুলোর প্রচুর বিষয়সম্পত্তি ছিল। মিশরের লোকেরা মৃত্যুর পরে অন্য এক জীবনে বিশ্বাসী ছিল বলে পুরোহিতদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে থাকে। তারা এই ক্ষমতার ব্যবহার করতেও ভালবাসত। আমেনহোটেপ 'ঈশ্বর এক' এই মত প্রচার করতে আরম্ভ করলে পুরোহিতরা অত্যন্ত রেগে যায়। এমন কি থিবিসের 'আমন-রা' দেবতার মন্দিরের পুরোহিতরা তাদের পুরনো ধর্ম স্বীকার না করার জন্য ফারাওকে খোলাখুলি ভাবে নিন্দা করে। কিছুদিন পরে রাজ্যের সমস্ত পুরোহিত বিদ্রোহ করে। আমেনহোটেপের তৈরি আখেটাটন শহরটি তারা ধ্বংস করে। শক্তিশালী পুরোহিতদের সন্তুষ্ট করার জন্য নতুন ফারাও আখেনাটন পুরনো ধর্মমতকেই মেনে নেন।

রাজস্ব-আদায়কারী, সৈন্য—যে-সব কর্মচারী রাজস্ব আদায় করত মিশরের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তারা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীল নদীর বন্যায় প্রতি বৎসর নদীর দু-তীরের জমিগুলো ভেসে

যেত। ফলে জমির সীমারেখা ঠিক রাখা বেশ কঠিন ছিল। রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারীরা কিন্তু বেশ দক্ষতার সঙ্গেই এই কাজ করত। জ্যামিতির সাহায্যে তারা জমির সীমারেখা নির্ভুলভাবে ঠিক করে দিত। এই রাজস্ব-আদায়কারীরাই দেশের শাসনবিভাগ ও সাধারণ লোকের মধ্যে যোগাযোগ রাখত।

মিশরের শাসকরা বাইরের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করার জন্য একটি বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন। নতুন রাজ্য জয়ের জন্যও সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। টাকা নিয়ে যে-কোন দেশের হয়ে যুদ্ধ করাও তখনকার দিনে একদল লোকের পেশা ছিল। এই সব সৈন্যদের ভাড়াটে যোদ্ধা বলা হত। তবে শান্তির সময়ে তারা অন্য কোন কাজ করত।

● ১। প্রাচীন মিশরে ছাব্বিশটি রাজবংশ রাজত্ব করে। এই রাজাদের ফারাও বলা হত।

২। মিশরের দেবতার মন্দিরের পুরোহিতরা খুব শক্তিশালী ছিল। অনেক সময় রাজারাও তাদের কথা শুনতে বাধ্য হত।

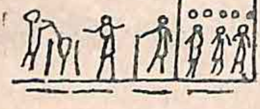
৩। রাজস্ব-আদায়কারীরা দেশের সাধারণ লোক এবং রাজার মধ্যে যোগাযোগ রাখত। সৈন্যরা দেশরক্ষা করত।

৩য় পাঠঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, লিখন-পদ্ধতি ও লেখক

জমির উর্বরতার জন্য মিশরের একদিকে যেমন কৃষির উন্নতি হয়, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দেশের ভিতরে ও বাইরের দেশের সঙ্গে মিশরের যোগাযোগ রাখার একমাত্র পথ ছিল নীল নদী। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেও দাঁড়টানা নৌকার সাহায্যে নীল নদীর পথে মিশরের বাণিজ্য হত। নিউবিয়া ও সুদানের সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক ছিল। এই বাণিজ্যের প্রধান পণ্যদ্রব্য ছিল সোনা, হাতির দাঁত, আবলুস কাঠ, ধূপধুনা, গঁদের আঠা, উটপাখির পালক ও ক্রীতদাস। পরে লোহিত সাগরের পথেও মিশরের বাণিজ্য হতে থাকে। এই পথে দক্ষিণে জাঞ্জিবার ও পূর্বে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত মিশরীয়দের নৌ-জাহাজ চলাচল

করত। পারস্য থেকে মূল্যবান নীল রঙের পাথর এবং সিনাই উপদ্বীপ থেকে তামা আমদানি করা হত। মিশরের নৌ-জাহাজ ক্রীটদ্বীপ এবং ফিনিশীয় বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্র সিডন ও টায়ার বন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করত। দু হাজার খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের আগেই বাইরের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে নীল নদীর তীরের এই অঞ্চলের বাণিজ্য খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়।

লিখন-পদ্ধতি ও লেখক—মিশরের চিত্রলিপি হায়ারোগ্লিফ নামে পরিচিত। মিশরীয়দের লিখন-পদ্ধতির আবিষ্কার মানব-সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিত্রলিপি দিয়ে তারা প্রথমে মনের ভাব প্রকাশ করত। কিন্তু চিত্রলিপির এই জটিল পদ্ধতি ধীরে ধীরে নানাভাবে বদলে যায়। প্রথম দিকে তাদের প্রায় দুহাজার সাঙ্কেতিক চিত্রলিপি ছিল। এই সব চিত্রলিপির নমুনা এখনও মিশরের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে খোদাই করা আছে। তার মধ্যে কতকগুলো পশু ও মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের মত আবার কতকগুলো পুরোপুরিভাবে জ্যামিতিক আকারের। পরে লেখার জন্য সাধারণভাবে সাত শ চিহ্ন ব্যবহার করা হত। এর প্রত্যেকটি চিহ্নই কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য ব্যবহৃত হত। কিন্তু কোন চিহ্নই কখনও তিনটির বেশি ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য ব্যবহৃত হত না। তবে প্রাচীন মিশরীয় লিখন-পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের কোন ব্যবহার ছিল না। স্বরবর্ণের ব্যবহার না থাকার জন্য আধুনিক যুগের লোকেদের পক্ষে মিশরের ভাষা আয়ত্ত করা বেশ কঠিন। চব্বিশ রকম ধ্বনি উচ্চারণের জন্য চব্বিশটি পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন ব্যবহার করা হত। মিশরীয়রা কোনকালেই বর্ণমালা অনুসারে লিখন-পদ্ধতির সৃষ্টি করেনি। তাদের লিখন-পদ্ধতি ছিল চিত্রলিপির সঙ্গে বর্ণমালার সুন্দর মিশ্রণ।



হায়ারোগ্লিফিক হরফ

জটিল ধরনের এই চিত্রলিপি লেখার জন্য একদল লোকের

প্রয়োজন হত। ধীরে ধীরে একদল দক্ষ চিত্রলিপি লেখকের সৃষ্টি হয়। মিশরীয় সভ্যতাবিকাশের প্রথম দিকে পুরোহিতদের মধ্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল। সেজন্য সাধারণত দেব-মন্দিরের পুরোহিতরাই এই লেখকদের পরিচালনা করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও হস্ত-লিপিতে দক্ষ বলে সমাজেও লেখকদের একটি বিশেষ সম্মান ছিল।

লেখার জন্য মিশরীয়রা এক ধরনের গাছ থেকে প্যাপাইরাস তৈরি করত। এগুলো দেখতে ছিল প্রায় আধুনিক কালের মোটা কাগজের মত। ইংরেজি ভাষার 'পেপার' শব্দটির সৃষ্টিও মিশরীয় প্যাপাইরাস শব্দ থেকে। লেখার জন্য ছিল নলখাগড়ার কলম ও এক ধরনের ছোট গাছের রস দিয়ে তৈরি কালি। লেখার তিনটি প্রয়োজনীয় জিনিস কাগজ, কলম ও কালির জন্য আধুনিক জগতের মানুষ মিশরের কাছে ঋণী।

● ১। নীল নদী ও পারস্য সাগরের পথে মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। পরে লোহিত সাগরের পথও তারা ব্যবহার করে।

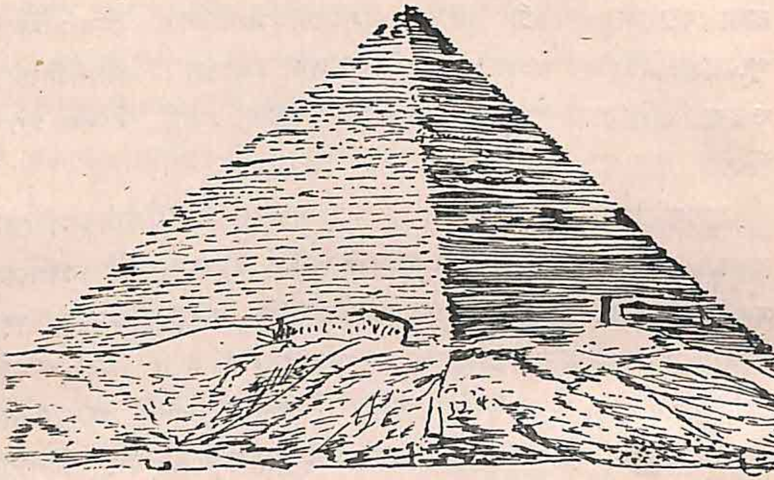
২। মিশরের লিখন-পদ্ধতি বা হায়ারোগ্লিফ ছিল চিত্রলিপির সঙ্গে বর্ণমালার সুন্দর মিশ্রণ। জটিল লিখন-পদ্ধতিতে লেখার জন্য দক্ষ লেখকের প্রয়োজন হত।

৩। লেখার তিনটি প্রয়োজনীয় জিনিস কাগজ (প্যাপাইরাস), কলম ও কালি মিশরের লোকেরা প্রথম আবিষ্কার করে।

৪র্থ পাঠ : পিরামিড

মিশরীয়দের কাছে মানুষের মৃত্যুর আগের ও পরের জীবন সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, মানুষের বেঁচে থাকার সময় যা-কিছুর প্রয়োজন থাকে, মৃত্যুর পরেও সে-সব কিছুর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। সেজন্য তারা মৃতদেহ ভালভাবে রাখার ও কবরের উপর সমাধি-মন্দির তৈরি করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। নব্য-প্রস্তর যুগ থেকেই তারা কবরের চারপাশে খাদ্যদ্রব্য ভরা মাটির পাত্র

রাখার ব্যবস্থা করত। অনেক সময় কবরের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রও দেওয়া হত। প্রথম দিকে কবরের চারদিকে পাথরের দেওয়াল তৈরি করা



পিরামিড

হত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ছাদ-দেওয়া উঁচু পিরামিড তৈরির রীতি প্রচলিত হয়।

দু-হাজার ন-শ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মেম্ফিসের কাছে গিজার ফারাও কুফু বা চিরপসের বিশাল পিরামিড তৈরির কাজ শুরু হয়। তের একর জমির উপর সাত-শ পঞ্চান্ন ফুট লম্বা এই পিরামিড মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় সমাধি-মন্দির। এটা তৈরি করতে গড়ে আড়াই টন ওজনের ২,৩০০,০০০টি পাথরের প্রয়োজন হয়। পিরামিডের একটি ঘরে ফারাও কুফুকে সমাধি দেওয়া হয়। কুফুর অনেক সভাসদকেও এই পিরামিডের কাছেই সমাধি দেওয়া হয়। মৃত্যুর পরেও ফারাও কুফু যাতে প্রজাদের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে পুরোহিতরা পিরামিডের ভিতরে প্রচুর খাদ্য মজুত করে রাখে। এই সব পিরামিডের প্রাচীরে নানাধরনের ছবি আঁকা আছে। ফারাওদের জীবনের কাহিনী নিয়েই এই ছবিগুলো আঁকা হয়েছে। এসব ছবি থেকে সে সময়ের ইতিহাসের অনেক কাহিনী জানা যায়।

মিশরের প্রাচীন রাজবংশগুলোর মধ্যে চতুর্থ রাজবংশ বিশাল পিরামিড তৈরির জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। অষ্টাদশ ও উনবিংশ রাজবংশও বিশাল বিশাল পিরামিড তৈরি করে। মিশরের পিরামিড-গুলোর মধ্যে আমেনহোটেপ, টুটেনখামেন, আখনাটন প্রভৃতি ফারাওদের পিরামিড আজও পৃথিবীর এক বিস্ময়ের বস্তু।

মিশরের লোকেরা মৃতব্যক্তির সমাধিতে শুধু পিরামিড তৈরি করে সন্তুষ্ট হয়নি। তাদের মতে মানুষের দেহে দেবতারা বাস করেন। সুতরাং তারা নানাধরনের সুগন্ধি দ্রব্য ও ওষুধ দিয়ে মানুষের মৃত-দেহকেও স্থায়িভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে। মৃতদেহ রক্ষা করার এই পদ্ধতিকে মমি বলা হয়।

● রাজাদের মৃতদেহ নিরাপদে রাখার জন্য বিশাল আকারের পিরামিড বা সমাধি তৈরি হত। মৃতদেহ সুগন্ধি ও ওষুধ দিয়ে স্থায়িভাবে রক্ষা করা হত। একে মমি বলা হয়।

৫ম পাঠ ঃ ধর্ম

প্রাচীন ও নব্য-প্রস্তর যুগেই মিশরের লোকের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। পরে কিছু কিছু পরিবর্তন হলেও মিশর থেকে পুরনো ধর্মমত কখনও একেবারে মুছে যায়নি। সূর্যের প্রচণ্ড তেজ, নীল নদীর বন্যা, ঋতুপরিবর্তন, মরুভূমির শুকনো বাতাস প্রভৃতি মিশরের কৃষির খুব ক্ষতি করত। মিশরের লোকের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। সুতরাং কৃষিকাজের এই শত্রুদের তারা প্রচণ্ড ভয় করত। এই ভয়ের জন্যই তারা সূর্য ও প্রকৃতিকে দেবতা বলে মনে করতে শুরু করে। জীবন ও মৃত্যুর নানা রহস্যের সমাধান করতে গিয়েও সূর্যকে তারা দেবতার আসনে বসায়। সূর্য দেবতা তাদের কাছে 'রা' নামে পরিচিত। হেলিওপেলিস শহরে 'রা'-দেবতার জন্য মন্দির তৈরি করা হয়। 'রা' ছাড়াও মিশরীয়দের অনেক দেবতা ছিল। হোরাস, টা, আমন-রা প্রভৃতি মিশরীয়দের অন্যান্য দেবতা। রা-দেবতার ছেলে আসিরিস। মিশরের লোকেরা ফারাওদের আসিরিসের বংশধর বলে

মনে করত। প্রত্যেক দেবতার জন্য পৃথক্ পৃথক্ মন্দির তৈরি হত। কখনও কখনও দেবতারা সপরিবারে কোন কোন মন্দিরে বাস



মিশরের দেবদেবী

করত। এক মন্দিরে বহু দেবতারও স্থান হত। পুরোহিতরা এই সব মন্দিরের দেবদেবীর উপাসনা ও দেবতাদের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব নিত।

● মিশরের লোকেরা বহু দেব-দেবতায় বিশ্বাস করত। এদের মধ্যে রা, হোরাস, টা, আমন-রা, আসিরিস বিখ্যাত।

৬ষ্ঠ পাঠ : প্রধান জীবিকা

কৃষিই ছিল মিশরীয়দের প্রধান জীবিকা। জমির উর্বরতা এবং অল্প পরিশ্রমে বেশি ফসল ফলানো যেত বলে বহু লোক জীবিকার জন্য জমির উপরে নির্ভর করত। ধীরে ধীরে জমির বড় বড় মালিকদের নিয়ে মিশরে একটি নতুন শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল

মিশরীয়দের অন্যতম প্রধান জীবিকা। সৈন্য বিভাগেও বেশ কিছু লোক কাজ করত।

মিশরের অর্থনৈতিক জীবনে শিল্পও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নব্য-প্রস্তর যুগের শিল্প ধীরে ধীরে খুব উন্নত হয়। মিশরে খুব ভাল কাপড় বোনা হত। কুমোরের চাক আবিষ্কারের আগে থেকেই মিশরের মাটির তৈরি জিনিস বেশ উন্নত ধরনের ছিল। পরে শিল্পের আরও উন্নতি হয়। ধাতু-শিল্পও উন্নত ছিল। সোনা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু দিয়ে নানাধরনের সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ও অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি করা হত। মিশরের আর একটি উন্নত শিল্প ছিল কাঁচ-শিল্প। প্রথম যুগে রঙিন কাঁচের ব্যবহার মিশরীয়দের জানা ছিল না। পরে তারা রঙিন কাঁচের জিনিসপত্র তৈরি করতে শেখে। অন্যান্য দেশের কাছে মিশরের তৈরি এই সব জিনিসপত্রের খুব চাহিদা ছিল। মাটি, ধাতু, কাঁচ, প্রভৃতি শিল্প মিশরের বহুলোকের খাবার যোগাত।

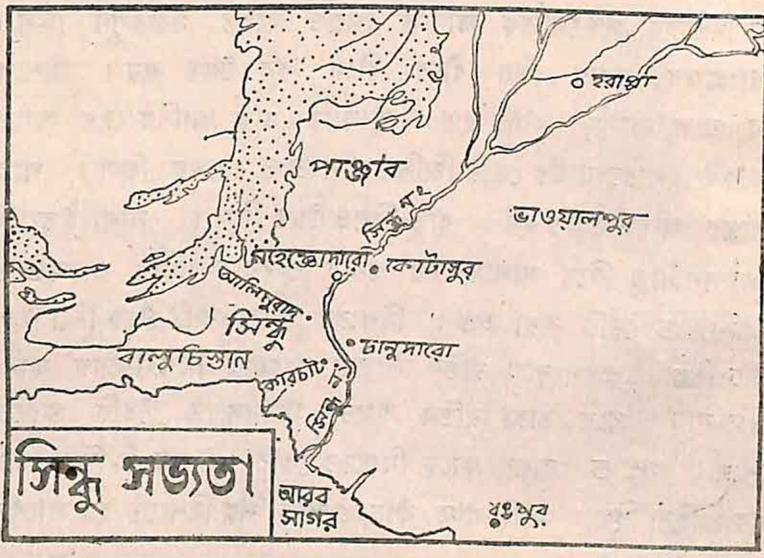
● চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, নানাধরনের শিল্প মিশরের লোকদের প্রধান জীবিকা ছিল।

গ. সিন্ধু-সভ্যতা

১ম পাঠঃ সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদারোতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ একটি বৌদ্ধ-স্তূপ খোঁড়ার সময় একটা প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে। সিন্ধী ভাষায় মহেঞ্জো-দারো শব্দের অর্থ মৃত্যুর দেশ। কয়েক বৎসর পরেই বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং তার কাছাকাছি কয়েকটি জায়গায় একই ধরনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে যে-সব নমুনা পাওয়া যায় সে-সব প্রায় একই যুগের ও একই সভ্যতার। সিন্ধুনদ ও তার শাখা-প্রশাখার তীরের বিভিন্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতাকে সিন্ধু-সভ্যতা বলা হয়। আগে ধারণা ছিল যে, বৈদিক সভ্যতা ও আর্যদের

সংস্কৃতিই ভারতের সবচেয়ে পুরনো সভ্যতা। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের সভ্যতা যে আরও প্রাচীন



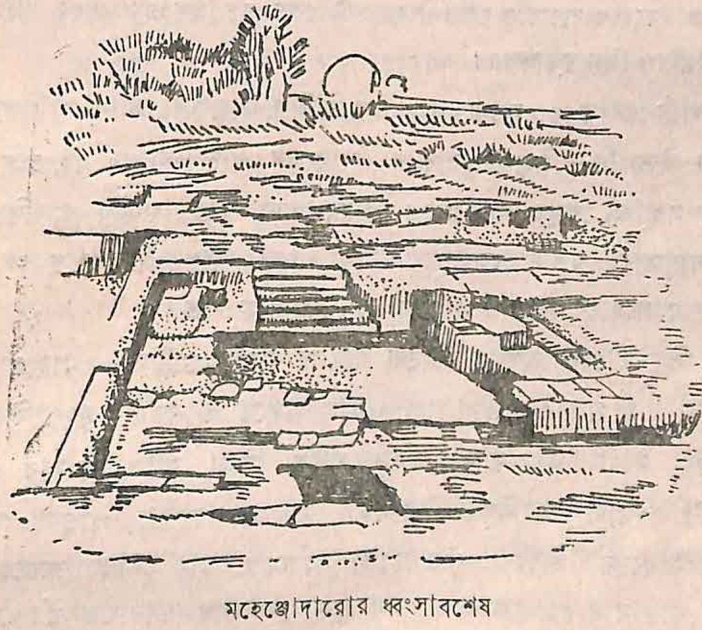
তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। পণ্ডিতদের মতে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অন্তত তিন হাজার বছর আগে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই সভ্যতা সুমের, মিশর ও ব্যাবিলোনীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার সমসাময়িক ছিল।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে যা পাওয়া গিয়েছে তা থেকে এক উন্নত নাগরিক সভ্যতার নমুনা পাওয়া যায়। চওড়া রাজপথ, বড় বড় দালান-কোঠা, উন্নত ধরনের নর্দমা সব-কিছুরই নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে। এখানকার লোকদের প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিসপত্র, সজ্জাদ্রব্য, অলঙ্কার ইত্যাদিরও প্রচুর নিদর্শন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এই সব জিনিসপত্র থেকে তখনকার লোকের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

● ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদারো, পাঞ্জাবের হরপ্পা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সভ্যতার সমসাময়িক সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার হয়।

২য় পাঠঃ নগর পরিকল্পনা

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত নগর দুটির পরিকল্পনা ছিল সুন্দর। মহেঞ্জোদারোর গোটা শহরটি চওড়া রাজপথ, বড় বড় দালান-কোঠা, সাধারণ লোকের জন্য স্নান করার জায়গা, উন্নত ধরনের নর্দমা ইত্যাদি দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। রাস্তার দুদিকের দু-তলা ও তিন-তলা দালানগুলো ছিল এই শহরের বিশেষ আকর্ষণ। শহর কয়েকটি পল্লীতে ভাগ করা ছিল। প্রত্যেক বাড়িতে ছিল কুয়ো, স্নানের জায়গা প্রভৃতি। বিভিন্ন অঞ্চলে পাহারা দেওয়ার জন্য পাহারাওয়ালার ব্যবস্থা ছিল। পাহারাওয়ালাদের ব্যবহৃত ঘরগুলোর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।



মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা শহর দুটির আয়তন ছিল তিন মাইলেরও বেশি। শহরের রাস্তাগুলো পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে পরস্পরকে ছেদ করেছিল। হরপ্পা নগরটি ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সম্ভবত মহেঞ্জোদারো নগরের চারদিকে কোন প্রাচীর ছিল না। মহেঞ্জোদারো শহরে একটি বিরাট প্রাসাদ এবং চারকোনাওয়ালা একটি বিরাট হলঘর

আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এই বিশাল প্রাসাদ ও হলঘরটি কি কাজে ব্যবহৃত হত তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। মহেঞ্জোদারোতে একটি বিরাট স্নানের জায়গাও আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত স্থানীয় সাধারণ লোকের স্নানের জন্য এটিকে ব্যবহার করা হত। হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি বিরাট শস্যের ভাণ্ডার পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু-সভ্যতার যুগের সমস্ত শহরগুলোই তৈরি হয়েছিল রোদে-পোড়ানো ইটের উঁচু ভিতের উপর। শহরের বাড়িঘরগুলো তৈরি হয়েছিল আগুনে পোড়ানো ইট দিয়ে। এই অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় যে, সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করেই মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা এই শহর দুটি তৈরি হয়।

● মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা শহর দুটি বেশ বড় ছিল এবং শহর দুটির পরিকল্পনাও ছিল খুব সুন্দর।

৩য় পাঠ : খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিস, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য

খাদ্য ইত্যাদি—সিন্ধু-উপত্যকার লোকদের খাদ্য ছিল গম, যব, চাল, শাক সব্‌জি, খেজুর আর ফল। গরু, ভেড়া, হাঁস, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংসও তারা খেত। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া মাছের আঁষ দেখে বলা যায় যে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার লোকেরা মাছ খেত।

সিন্ধু-তীরের অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের বুনো পশু ছিল। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার লোকেরা পশু পালন করতে জানত। গৃহপালিত পশুর মধ্যে কুঁজওয়ালা ষাঁড়, মহিষ, ভেড়া, হাতি, শুয়োর ও উটের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া বহু সীলমোহরের উপরও কুঁজওয়ালা ষাঁড়ের ছবি আঁকা রয়েছে। তা থেকে মনে হয় বর্তমান কালের মত তখনকার ভারতেও ষাঁড়কে পবিত্র প্রাণী বলে মনে করা হত। কিন্তু মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘোড়ার কোন কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায়নি। মনে হয়, ঐ শহর দুটির লোকেরা ঘোড়ার ব্যবহার জানত না। গরু ও সিংহ তাদের কাছে অপরিচিত প্রাণী ছিল না। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া মাটির খেলনা দেখে মনে হয় যে কুকুর, বাঁদর, বাঘ, ভালুক,

খরগোশ, বাইসন ও গণ্ডার প্রভৃতি প্রাণী তাদের কাছে পরিচিত ছিল। গাধা, বেজি, কাঠবিড়ালি, ময়ূর তোতাপাখি ও গৃহপালিত মুরগীর কথা তারা জানত। হরপ্পায় বিড়ালকেও গৃহপালিত পশু হিসেবে মনে করা হত।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগের পোশাক-পরিচ্ছদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে সম্ভবত সূতী ও পশমী দুধরনের পোশাকই তারা ব্যবহার করত। সোনা-রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, হাতির দাঁতের অলঙ্কার সে-যুগে প্রচলিত ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলঙ্কার ব্যবহার করত। নানাধরনের প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহারেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

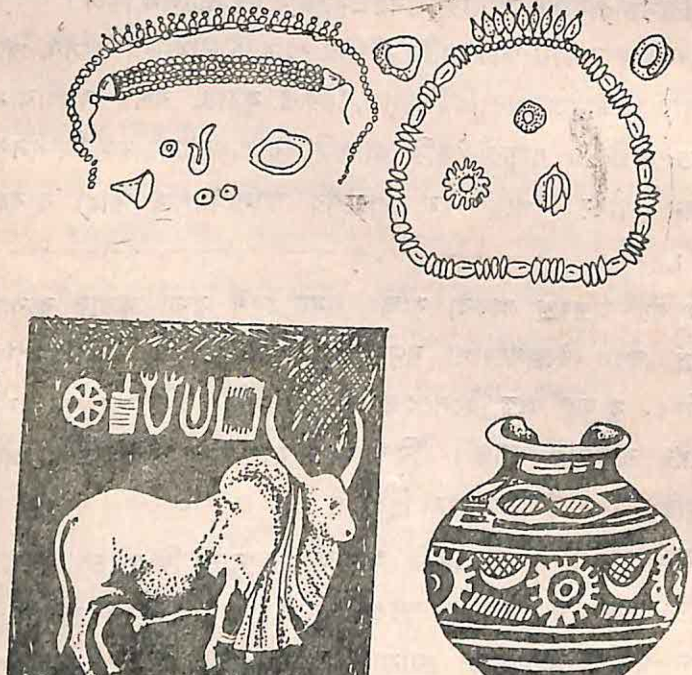
সুন্দর কারুকার্য-করা মাটির বিভিন্ন পাত্র, চীনামাটির বাসন, তামা ও রূপার পাত্র, ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র, চিরুণী, কুঠার, বর্শা, থালাবাসন প্রভৃতি মাটি ও ধাতুর তৈরি প্রতিদিনের ব্যবহারের বহু জিনিসপত্র সেখানে পাওয়া গেছে। নানাধরনের আসবাবপত্র তারা ব্যবহার করত।

যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র অথবা যুদ্ধের সময় দেশ রক্ষা করার ব্যবস্থার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য নমুনা মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পায় পাওয়া যায়নি। যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে তারা ব্রোঞ্জের তৈরি তীর ধনুক, বর্শা ও কুঠারের ব্যবহার করত। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ঢাল জাতীয় অস্ত্রের ব্যবহার সম্ভবত তাদের জানা ছিল না।

চাকাওয়ালা ছোট ছোট অনেক খেলনা-গাড়ি পাওয়া গিয়েছে। চাকার ব্যবহার যে সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা বহুদিন ধরেই জানত এই খেলনা-গাড়ি থেকে তা বোঝা যায়। মাটির তৈরি মেয়ে-পুরুষ, পশু-পাখি থেকে শুরু করে নানারকম বাঁশি, ঝুনঝুনি ও অন্যান্য বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র এখানে পাওয়া গিয়েছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে গরুর গাড়ির প্রচলন ছিল।

শিল্প—দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্যই মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার লোকেরা শিল্পের সৃষ্টি করেছিল। নিছক অলঙ্করণ বা সৌন্দর্যের জন্যই সেখানে শিল্প-চর্চার প্রচলন ছিল বলে মনে হয় না। অলঙ্করণ ছাড়া

বিরাট বিরাট দালান-কোঠা, অস্ত্রশস্ত্র, মাটির বাসনপত্র ও প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিসপত্র থেকে তা প্রমাণিত হয়। তবে মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা অনেক রকম পশুর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর পরিমাণে সীলমোহর পাওয়া গেছে। এই সব সীলমোহরে সাধারণত কুঁজওয়ালা ষাঁড়, বাইসন ও মহিষের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। তবে পশুর ছবি আঁকার ধরন দেখে মনে হয় এই সব পশু শিল্পীর কাছে খুব ভালভাবেই পরিচিত ছিল। ব্রোঞ্জের তৈরি যে নর্তকী মূর্তি পাওয়া গেছে, নানাদিক থেকেই সে-মূর্তিটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।



সিন্ধু-সভ্যতার শিল্পের নমুনা

তবে পাথরের তৈরি মূর্তির সংখ্যা এখানে খুব কম। তা ছাড়া শিল্পীরা এখানে সাধারণত খুব নরম ধরনের পাথর ব্যবহার করত। তবে হরপ্পায় পাওয়া মানুষের ছোট ছোট কয়েকটি মূর্তি শিল্পীদের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার

পাওয়া কয়েকটি সীলমোহরে এক ধরনের চিত্রলিপিও খোদাই করা আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সব চিত্রলিপি পড়া যায়নি। এই সব চিত্রলিপির অর্থ বোঝা গেলে সিন্ধুনদ অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যেতে পারত। তবে মনে হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারেই এই সব সীলমোহরগুলোর ব্যবহার হত।

মাটির তৈরি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অনেক নমুনা চান্থ-দারোতে পাওয়া গেছে। মনে হয় চান্থ-দারোতে মাটির তৈরি জিনিসপত্রের কারখানা ছিল।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার লোকেরা খুব ভালোভাবেই ধাতুর ব্যবহার জানত। সোনা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর তৈরি বহু রকম জিনিসপত্র এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। মূল্যবান ধাতু সাধারণত অলঙ্কারের জন্য ব্যবহার করা হত। মেয়ে ও পুরুষ সবাই যে অলঙ্কার ব্যবহার করত তা সে-যুগের নানারকম অলঙ্কারের নমুনা থেকে জানা গিয়েছে। তামা, ব্রোঞ্জ, টিন প্রভৃতি ধাতু অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত হত। ব্রোঞ্জের তৈরি প্রচুর জিনিসপত্র থেকে মনে হয় মহেঞ্জোদারোর লোকেরা সে-সময়ের অন্য যে-কোন সভ্য জাতির চেয়ে ধাতুর ব্যবহার অনেক বেশি জানত।

অলঙ্কারের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য নানারকম শঙ্খের ব্যবহার করা হত। মহেঞ্জোদারোর লোকেরা শঙ্খের ব্যবহার জানলেও সম্ভবত ঝিনুকের ব্যবহার জানত না। হাতির দাঁতের কাজের নমুনা খুব বেশি পাওয়া যায়নি। মনে হয় হাতিকে প্রবিত্র প্রাণী হিসেবে দেখা হত বলেই শুধু শিল্পের প্রয়োজনে হাতি শিকার করা হত না। সত্যিকারের কাঁচ-শিল্পের কোন নমুনা মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত হয়নি। তবে ধাতুর তৈরি জিনিসপত্র চকচকে করার জন্য তারা এক ধরনের প্রলেপ ব্যবহার করত।

ব্যবসা-বাণিজ্য— মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। নানাধরনের মূল্যবান ধাতু এবং অন্যান্য জিনিসপত্র আমদানি করার জন্য তারা ভারত এবং ভারতের বাইরের অনেক

দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতের অনেক অঞ্চলের, বিশেষত কাশ্মীর, মহীশূর ও নীলগিরি পর্বত অঞ্চলের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ার অনেক দেশের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। মহীশূরের কোলার থেকে তারা সোনা আমদানি করত। আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া ও পারস্য থেকে রূপা আনত। মহেঞ্জোদারোর পাশের অঞ্চলে তামা পাওয়া গেলেও তারা রাজস্থান, বালুচিস্তান ও মাদ্রাজ থেকে তামা আমদানি করত। প্রাচীনকালে ভারতের অনেক জায়গাতেই সীসা পাওয়া যেত। সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা আজমীঢ় থেকে সীসা আমদানি করত। ভারতের সমুদ্র তীরের অঞ্চল ও পারস্য উপসাগরীয় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শঙ্খ আমদানি করা হত।

সুমেরের সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল এখানকার ধ্বংসস্তূপ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। মিশর ও ক্রীটের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। মাস্তল ছাড়া জাহাজের ছবি আঁকা একটি সীলমোহর মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গিয়েছে। সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে তারা যে পরিচিত ছিল এই সীলমোহরের জাহাজের ছবি থেকে তা বোঝা যায়। এই সীলমোহরের সঙ্গে মিনোয়ান সভ্যতার প্রথম যুগের সীলমোহরের বেশ মিল আছে। সুমের ও মিশরের সীলমোহরের সঙ্গেও এই সীলমোহরের কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সম্ভবত সমুদ্র-পথেও সুমের ও ইলামের সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ দেখে মনে হয় যে, মহেঞ্জোদারোতে বেশ বড় একটা বাণিজ্য বন্দর ছিল এবং সেই বন্দর দিয়েই উর, কিশ এমন কি মিশরের সঙ্গেও তার বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

● ১। সিন্ধু-সভ্যতার লোকের প্রধান খাদ্য ছিল যব, গম, চাল, শাক-সব্জি, খেজুর, ফল, মাছ ও মাংস।

২। সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা বিভিন্ন ধাতু ও মাটির তৈরি নানা জিনিস-পত্র ব্যবহার করত।

৩। সিন্ধু-সভ্যতার শিল্প খুব উন্নত ছিল। ধাতু, মাটি, পাথর, শঙ্খ ও হাতির দাঁতের কারুকার্য-করা নানা সুন্দর নমুনা এখানে পাওয়া গেছে।

৪। সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা স্থল ও জলপথে দেশে এবং বিদেশে বাণিজ্য করত।

৪র্থ পাঠ : উপাসনা

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার লোকেদের ধর্মজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কারণ সেখানে কোন দেবদেবীর মূর্তি, পূজার দেবী অথবা কোন দেব-মন্দির আবিষ্কৃত হয়নি। প্রাচীনকালের প্রত্যেকটি সভ্য দেশেই সমাজজীবনে ধর্মের একটি বিশেষ স্থান ছিল। কিন্তু সিন্ধু অঞ্চলের জনসাধারণের ধর্মজীবনের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে সেখানকার লোকের ধর্মজীবন সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সম্ভবত এই অঞ্চলের লোকেরা মাতৃমূর্তির পূজা করত। পোড়া মাটির তৈরি কয়েকটি মাতৃমূর্তি বা প্রকৃতিদেবীর মূর্তি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীনকালের অনেক সভ্য দেশে, বিশেষত পারস্য থেকে ঈজীয় সমুদ্র পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলের লোকেরা মাতৃমূর্তির পূজা করত। মনে হয় মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় এই ধরনের





সিন্ধু-সভ্যতার দেবদেবী

পূজারই প্রচলন ছিল। মাতৃমূর্তি ছাড়াও তিনটি মুখওয়ালা এক যোগী পুরুষের মাথায় শিং ও তার চারদিকে মহিষ, গণ্ডার, হাতি, বাঘ

প্রভৃতি পশুর ছবি আঁকা একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয় এই যোগী পুরুষের মূর্তি পশুপতি শিবের। পরে পশুপতির আরও দুটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মূর্তিগুলো থেকে মনে হয় সেকালেও পশুপতি বা শিবপূজার প্রচলন ছিল।

মাতৃদেবী ও পশুপতি ছাড়া আগুন, জল, গাছ, সাপ ও পশু পূজার প্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কয়েকটি সীলমোহরে গাছের পূজার পরিচয় পাওয়া যায়। আয়তক্ষেত্রের আকারের দেবীর ধ্বংসাবশেষ থেকে মনে হয় অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল। চক্র ও স্বস্তিক চিহ্নের ব্যবহার থেকে মনে হয় সূর্যপূজা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালের অন্যান্য জাতির মত তারা লিঙ্গ-পূজাও করত। সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা মড়া পোড়াত বা কবর দিত।

● সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা আগুন, জল, গাছ, সাপ এবং নানা দেব-দেবীর পূজা করত।

৫ম পাঠ : সিন্ধু-সভ্যতার সমাজের শ্রেণীবিভাগ

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে সেখানকার সামাজিক শ্রেণীবিভাগের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই শ্রেণীবিভাগ মনে হয় সুনির্দিষ্ট ও অনড় ছিল না। এক শ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণীর কাজকর্মে অংশ নিত না এমন কোন প্রমাণ নেই। খাদ্য-উৎপাদনকারী একটা শ্রেণী অবশ্যই ছিল, যাদের মধ্যে কৃষক ও জেলে উল্লেখযোগ্য। মাংসের যোগান সম্ভবত গৃহপালিত পশু এবং শিকার থেকে পাওয়া যেত। অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শন এবং নগর-প্রহরীদের ঘর দেখে অনুমান করা যায় যুদ্ধজীবী একটি শ্রেণী ছিল। নানা ধাতুর তৈরি অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার ও মাটির তৈরি অন্যান্য জিনিসপত্র দেখে বোঝা যায় নানাধরনের কারিগর সেখানে বাস করত—ছোট ছোট খেলনা তৈরির শিল্পী থেকে শুরু করে বড় বড় বাড়ি তৈরির রাজমজুর পর্যন্ত। নানাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা যা জানা যায় তা ব্যবসায়ী শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রমাণ করে। সুপরি-

কল্পিত নগর এবং গৃহাদি দেখে উচ্চশিক্ষিত বাস্তুকারের (ইন্‌জিনিয়ার) এবং খোদাই-করা চিত্রলিপি দেখে শিক্ষাজীবী একটা সামাজিক স্তরের-পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মচর্চার যেসব নিদর্শন মিলেছে তা থেকে পুরোহিত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা যেতে পারে, তবে ঠিকভাবে কিছু বলা যায় না।

● সিন্ধু-সভ্যতার লোকের শ্রেণী ছিল—খাদ্য-উৎপাদনকারী (কৃষক ও জেলে), নানা বৃত্তির কারিগর, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত বাস্তুকার এবং শিক্ষাজীবী।

ঘ. চীন

১ম পাঠ : হোয়াং হো ও ইয়াংসি কিয়াং উপত্যকা, প্রাচীন যুগের চীন, পুরাণ-কাহিনী

হোয়াং হো ও ইয়াংসি কিয়াং উপত্যকা—সিন্ধু, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস ও নীলনদীর তীরের অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার মত চীন দেশের হোয়াং হো ও ইয়াংসি কিয়াং নদীর তীরে এক উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়। হোয়াং হো বা পীত নদী মধ্য-এশিয়ার মালভূমি থেকে বেরিয়ে অনেক পথ পেরিয়ে পোহাই উপসাগরে পড়ে। বারবার বন্যা হওয়ায় নদীটি অনেকবার খাত পরিবর্তন করে। মোহনার দিকে ব-দ্বীপ থাকায় এই নদী নৌকা চলাচলের উপযুক্তও নয়। প্রতি বৎসর বন্যা হত বলে হোয়াং হো নদীটি 'চীনের দুঃখ' নামে পরিচিত। আবার বন্যার জলে বয়ে-আসা পলিমাটিতে এই নদীর দুই পাশের জমিও অত্যন্ত উর্বর হয়ে ওঠে। নব্য-প্রস্তর যুগের সময় থেকে এই উর্বর জমিতে প্রচুর খাদ্যশস্য ফলত। এই সব খাদ্য-শস্যের মধ্যে ধানের ফলনই ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের জন্য এই অঞ্চলের লোকসংখ্যাও খুব দ্রুত বেড়ে যায়। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে হোয়াং হো নদীর তীরের লোকেরা একটি উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করে। হোয়াং হো নদীর উপত্যকা অঞ্চল প্রাচীন চীন সভ্যতার জন্মস্থান হিসেবে পূর্ব-এশিয়ার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে প্রাচীন চীনের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে ইয়াংসি কিয়াং -উপত্যকা অঞ্চলই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিব্বতের মালভূমিতে ইয়াংসি কিয়াং নদীর জন্ম। চিন-লিং শান পর্বতের দক্ষিণ দিক দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ইয়াংসি কিয়াং চীন সাগরে পড়েছে। তিব্বতের মালভূমি থেকে বয়ে-আনা লাল রঙের পলিমাটি দিয়ে ইয়াংসি কিয়াং নদীর দুই তীরের বিরাট অঞ্চল গড়া। এই পলিমাটি অত্যন্ত উর্বর। ফলে এই অঞ্চলে খাদ্যশস্যের ফলন হত প্রচুর। প্রাচীনকালে সভ্যতা বিকাশের জন্য যে-সব জিনিসের প্রয়োজন হত, ইয়াংসি কিয়াং নদীর উপত্যকা অঞ্চলে তার কোন-কিছুরই অভাব ছিল না।

প্রাচীন যুগের চীন—নব্য-প্রস্তর যুগে চীনের হোয়াং হো ও ইয়াংসি কিয়াং নদীর উপত্যকা অঞ্চলে এক সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই সময়ের লোকেরা কৃষির উপর নির্ভর করত। ব্রোঞ্জ যুগে এখানকার অবস্থার আরও উন্নতি হয় এবং লোকসংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। সি ও ইয়াংসি কিয়াং নদীর উপত্যকা অঞ্চলে প্রচুর ধানের ফলন হত। গৃহপালিত পশুর মধ্যে মহিষ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হোয়াং হো বা পীত নদী এবং তার শাখানদী ওয়েই-এর অববাহিকা অঞ্চলেও কৃষি-নির্ভর এক সভ্যতা গড়ে ওঠে।

ইয়াংসি কিয়াং ও হোয়াং হো নদীর তীরের অঞ্চল খুঁড়ে প্রাচীন যুগের সভ্যতার অনেক নমুনা পাওয়া গিয়েছে। মসৃণ ও ধারালো পাথরের তৈরি কুড়ুল, শক্ত মাটি বা পাথরের বল ছোঁড়ার ধনুক অনেক পাওয়া গিয়েছে। জোয়ার ছিল তাদের প্রধান খাদ্যশস্য। কুকুর ও শুয়োর প্রভৃতি পশু বাড়িতে পালন করা হত। নানারকম লতা, বেত ও বাঁশ দিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের ঝুড়ি, মাদুর ইত্যাদি তৈরি করত। কাপড় বোনার কৌশলও তারা আবিষ্কার করে। নানারকম মাটির পাত্র তারা তৈরি করত। এই সব মাটির পাত্রের মধ্যে বেশির ভাগই খুব সাধাসিধে ধরনের। কখনও কখনও এইসব পাত্রে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা হত। তবে

এই সব ছবির বেশির ভাগই জ্যামিতিক চিত্র। গৃহে ব্যবহৃত আসবাব-পত্রের মধ্যে তে-পায়া টেবিল ও ফাঁপা-পায়াওয়ালা মাটির পাত্রগুলো দেখবার মত। নব্য-প্রস্তর যুগের শেষের দিকের এই সভ্যতা হোয়াং হো ও ওয়েই নদীর উপত্যকা অঞ্চলে ও মাঞ্চুরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম দিকে ডুঙ্গারিয়া ও সিন্‌কিয়াং অঞ্চলেও এই সভ্যতার প্রভাব পড়ে।

চীনদেশে প্রাচীন সভ্যতার যেসব নমুনা পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় যে, প্রায় দু-হাজার খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ চীনে একই সঙ্গে সভ্যতার সৃষ্টি হয়। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে অনেক যুদ্ধ, মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। তবে সম্ভবত দক্ষিণ অঞ্চলের সভ্যতাই উত্তর অঞ্চলের সভ্যতার চেয়ে বেশি উন্নত ছিল।

পশ্চিমের আর্য সভ্যতায় সুমেরীয়রা এবং ভারতের আর্য সভ্যতায় সিন্ধু অঞ্চলের দ্রাবিড় জাতি যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, দক্ষিণ-চীনের লোকেরাও উত্তর-চীনের সভ্যতা গড়ে ওঠার ব্যাপারে তেমনি প্রভাব বিস্তার করেছে। সম্ভবত দক্ষিণ-চীনের লোকেরাই ছিল ওই অঞ্চলের প্রথম কৃষিজীবী এবং তারাই প্রথম দেবতার মন্দির তৈরি করে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অভাবের জন্য এদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা সম্ভব হয়নি।

পৌরাণিক কাহিনী—চীনদেশে অনেক পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সব পৌরাণিক কাহিনী সেখানে আজও জনপ্রিয়। এই সব কাহিনীর মধ্যে বন্যা সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনীটি বেশ সুন্দর।

অনেকদিন আগে চীনে একবার ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। এই বন্যার ফলে সমস্ত দেশ মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে ওঠে। সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশা দেখে রাজা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজা তখন য়ি নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ তের বছর য়ি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। পরিশ্রম

করতে করতে 'য়ি'র হাতে ও পায়ে শক্ত কড়া পড়ে যায়। এই তের বছরের মধ্যে একবারের জন্যও তিনি নিজের বাড়িতে যাওয়ার সময় পাননি। শেষ পর্যন্ত 'য়ি'র পরিশ্রম সার্থক হল। কতকগুলো খাল কেটে তিনি বিভিন্ন জায়গায় আটকে-থাকা জল নিকাশের ব্যবস্থা করেন। এই জল যাতে সমুদ্রে চলে যেতে পারে তিনি তারও বন্দোবস্ত করেন। জল নিকাশের পর দেশের লোকেরা আবার বাড়িঘর তৈরি করে সুখে শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পায়। এই সম্পর্কে চীনদেশে একটা প্রবাদও প্রচলিত আছে: "য়ি চেষ্টা না করলে আমরা সবাই মাছের মত জলে বাস করতে বাধ্য হতাম।"

● ১। হোয়াং হো ও ইয়াংসি কিয়াং এই দুটি নদীর তীরে চীনের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে।

২। প্রাচীনকালের চীন চাষবাস ও শিল্পে খুব উন্নত ছিল। চীনের লোকেরা প্রথম কাপড় বুনতে শেখে।

৩। প্রাচীনকালের চীনে বন্যার সম্বন্ধে এক সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী আছে।

৬. প্রাচীন যুগের নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১ম পাঠ: অর্থনৈতিক জীবন

প্রাচীন যুগে সকল সভ্যতাই নদীর তীরে গড়ে ওঠে। নীল নদীর তীরে মিশরের সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপোটামিয়ার সভ্যতা, সিন্ধু নদের তীরে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা এবং হোয়াং হো ও ইয়াংসি কিয়াং নদীর তীরে চীনের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে। নদীর তীরের উর্বর অঞ্চলে প্রচুর খাদ্যশস্যের ফলন, গৃহপালিত পশুর চরে বেড়াবার মত অনেক জমি, পানীয় জলের প্রাচুর্য, নদীর সাহায্যে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সভ্যতা গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। এ কথা সত্যি যে মিশরের সভ্যতা নীল নদীর, মেসোপোটামিয়ার

সভ্যতা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস, সিন্ধু সভ্যতা সিন্ধু নদের ও চীনের প্রাচীন সভ্যতা হোয়াং হো ও ইয়াংসি কিয়াং নদীর জন্যই সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন যুগের লোকেরাও নদীর এই গুরুত্বের কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করত এবং বিভিন্ন অঞ্চলেই নদীকে দেবতা বা দেবতার দান বলে মনে করা হত।

প্রাচীনকালের প্রত্যেকটি সভ্যদেশের জনসাধারণেরই জীবিকার প্রধান উপায় ছিল কৃষিকাজ, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য। পশু-পালনের সঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল সভ্যতার ও অর্থনীতির সম্পর্ক অনেক গভীর। সেজন্য প্রাচীনকালে প্রতিটি সভ্য দেশই কৃষিকাজ ছাড়াও পশুপালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে যায়। কৃষি ও পশুপালনের পাশে পাশে প্রতিটি দেশেই কিছু কিছু শিল্পও গড়ে ওঠে। শিল্পের সাহায্যে দেশের লোকেরা জীবিকার নতুন একটা উপায় খুঁজে পায়। জীবনের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাধারণত মাটি, পাথর বা নানাধরনের ধাতু দিয়ে তৈরি হত। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিময়-প্রথা প্রায় সবদেশেই প্রচলিত ছিল। তবে পরে জিনিসপত্র বিনিময়-প্রথার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান ধাতু বিনিময়ের ব্যবস্থারও প্রচলন হয়। বিভিন্ন দেশে জিনিসপত্রের তৈরির পদ্ধতি ও কারুকার্যের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। আচার-ব্যবহারে ধ্যান-ধারণায়, পোশাক-পরিচ্ছদে হোয়াং হো ও ইয়াংসি কিয়াং নদীর তীরের অঞ্চলের লোকের সঙ্গে নীল নদীর তীরের অঞ্চলের লোকের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না।

● প্রাচীন যুগের সকল সভ্যতাই নদীর দান। চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সব-কিছুই নদীর উপর নির্ভর করত।

২য় পাঠ : সামাজিক জীবন

মানব-সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম যুগে সামাজিক জীবনে মানুষে

মানুষে কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু জীবিকার পার্থক্যের জন্যই সামাজিক জীবনেও পরে পার্থক্য দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ গড়ে ওঠে। সাধারণভাবে প্রত্যেক দেশেই পুরোহিত, সৈনিক, বণিক ও শ্রমিক এই চারটি শ্রেণী দেখা দেয়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আরও পরিবর্তন আসে। যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস করা হত। জমির বড় বড় মালিকদের নিয়ে সমাজে একটি নতুন অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীনকালের বিভিন্ন সভ্যজাতির মধ্যে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট তৈরির ধরনে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। প্রথম যুগে রোদে পোড়ানো ও পরে আগুনে পোড়ানো ইটের ব্যবহার সবদেশেই দেখা যায়। জনসাধারণের ঘরবাড়ি, মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থান, দেবমন্দির প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রায় সবদেশেই প্রচুর পরিমাণে পাথরের ব্যবহার হত। প্রাচীনকালের সভ্যতা সাধারণত কোন-একটি নগরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠত। নগরের চারদিকে প্রাচীর দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রায় সবদেশেই প্রচলিত ছিল। প্রশস্ত ও সোজাসুজি রাজপথ তৈরি হত। রাজপথের দুপাশে নর্দমার ব্যবস্থা এবং রাজপথের কোন অংশ যাতে বে-আইনীভাবে কেউ দখল না করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সবদেশেই সাধারণত চাকাওয়ালা গরুর গাড়ির প্রচলন ছিল। নদীপথে যাতায়াতের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নৌকা ও বিনা মাস্তুলের জাহাজের প্রচলন ছিল।

দু-একটি অঞ্চল ছাড়া সাধারণত প্রাচীনকালের প্রত্যেক শহরেই একটি করে দেব-মন্দির থাকত। স্থানীয় লোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই সব দেব-মন্দিরের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। জনসাধারণের জীবনের উপরে পুরোহিতদের প্রভাব ছিল গভীর। প্রাচীনকালের প্রায় সমস্ত সভ্যদেশে, বিশেষত পশ্চিম-এশিয়ার ও আফ্রিকার দেশ-

গুলোতে এই পুরোহিতদের মধ্য থেকেই দেশের প্রথম শাসকদের সৃষ্টি হয়।

প্রাচীনকালের সভ্যতার আর একটি বৈশিষ্ট্য চিত্রলিপি। চিত্রলিপিই ধীরে ধীরে বর্ণ লিপিতে পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেক দেশের চিত্রলিপির মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও কতকগুলো মিলও দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে পরিচিত পশু-পাখি, মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ এবং অন্যান্য পরিচিত জিনিসপত্রের ছবি চিত্রলিপিতে আঁকা হত। পাথর বা ধাতুর সীলমোহর প্রায় প্রতিটি প্রাচীন দেশেই ব্যবহৃত হত। সীলমোহরের প্রয়োজন হত সরকারী কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের অনেক কাহিনী এই সীলমোহরের সাহায্যে জানা যেতে পারে।

ধর্মে বিশ্বাস প্রাচীনকালের প্রতিটি দেশের ইতিহাসেই দেখা যায়। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার কাছে অসহায় মানুষ মনের দুর্বলতা থেকেই প্রথম ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বহু দেব-দেবতার অস্তিত্বে সে বিশ্বাস করতে থাকে। গাছ, সাপ, আগুন, জল প্রভৃতিও মানুষের কাছে দেবতার সম্মান পেতে শুরু করে। লিঙ্গ পূজার পদ্ধতি প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রচলিত ছিল। অনেক দেশেই মাতৃ-পূজার প্রচলন ছিল। 'ঈশ্বর এক' এমন ধরনের চিন্তাধারা কোন কোন দেশে দেখা গেলেও সাধারণ মানুষ এই মতবাদ মেনে নেয়নি।

পৌরাণিক কাহিনী এবং কিছু কিছু অলৌকিক কাহিনী প্রাচীন যুগের মানুষের চিন্তা ও বিভিন্ন কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করত। এই সব কাহিনীর সবগুলিই বাজে ছিল না। কোন কোন সময় প্রাচীন যুগের মানুষের কাছে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা করার জন্য পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টি হত। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে দেব-দেবীর নাম জড়িয়ে থাকায় সাধারণ লোক সহজভাবেই এই সব কাহিনী বিশ্বাস করত।

● প্রাচীনকালের সমস্ত সভ্যদেশের সামাজিক জীবন প্রায় একরকম ছিল।

অনুশীলনী

১। মেসোপোটামিয়া কোথায় অবস্থিত? মেসোপোটামিয়ার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। প্রাচীনকালে মেসোপোটামিয়ায় সভ্যতা গড়ে ওঠে কেন?

৩। মেসোপোটামিয়ার চাষবাসের একটি বিবরণ দাও।

৪। বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য মেসোপোটামিয়ায় কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হত? বন্যার ফলে সে-দেশের কি কি উপকার হত?

৫। মেসোপোটামিয়ার লোকদের প্রধান প্রধান জীবিকা কি ছিল?

৬। মেসোপোটামিয়ার লোকদের দেব-মন্দির ও বুরুজ তৈরির একটি বিবরণ দাও।

৭। মেসোপোটামিয়ার লোকেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল?

৮। কিউনিফর্ম বর্ণমালা কাকে বলে?

৯। সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) মেসোপোটামিয়ার নগর-রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে কি জান? (খ) মেসোপোটামিয়ার লোকেদের প্রধান খাদ্য কি ছিল? (গ) মেসোপোটামিয়ার মন্দিরের পুরোহিতরা কি কাজ করত? (ঘ) কিভাবে মেসোপোটামিয়ার দেব-মন্দিরগুলো তৈরি হত?

১০। সঠিক উত্তরটিতে এই '✓' দাও :—

(ক) পশ্চিম-এশিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলই মরুভূমি/সমতল। (খ) সুমেরীয় লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী/অলস ছিল। (গ) প্রত্যেক শহরে একটি করে দেব-মন্দির থাকত/থাকত না। (ঘ) যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নৌকার প্রচলন ছিল/ছিল না।

১১। মিশর কোথায় অবস্থিত? মিশরের ভূ-প্রকৃতির একটি বিবরণ দাও।

১২। মিশরের ফারাওদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৩। মিশরের পুরোহিতদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৪। মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন ছিল?

১৫। মিশরের লিখন-পদ্ধতি কেমন ছিল? লেখকদের কাজ কি ছিল?

১৬। পিরামিড কি? কিভাবে ও কেন পিরামিড তৈরি হত? ফারাও কুফুর পিরামিড সম্বন্ধে কি জান?

১৭। মিশরের লোকেদের ধর্ম সম্বন্ধে কি জান?

১৮। প্রাচীন মিশরের লোকেদের কি কি জীবিকা ছিল?

১৯। সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) মিশরের সভ্যতার উপর বাইরের প্রভাব নেই কেন? (খ) মিশরের জমি কি রকম উর্বর ছিল? মিশরের এইসব জমিতে কি জন্মাত? (গ) মিশরের লিখন-পদ্ধতিকে কি বলা হয়? কিভাবে এগুলো লেখা হত? (ঘ) লেখার কোন্ কোন্ জিনিসের জন্য বর্তমান যুগের লোকেরাও মিশরীয়দের কাছে ঋণী? (ঙ) কোন্ কোন্ শিল্পে মিশরের লোকেরা খুব নিপুণ ছিল?

২০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) মৃতদেহ রক্ষা করার এই পদ্ধতিকে — বলা হয়। (খ) মিশরে খুব উন্নত ধরনের — বোনা হত। (গ) মিশরের চিত্রলিপি — নামে পরিচিত। (ঘ) মিশরে পর পর — রাজবংশ রাজত্ব করে। (ঙ) মিশরের উর্বর জমিতে প্রচুর — জন্মাত। (চ) মিশরের লিখন-পদ্ধতি ছিল — সঙ্গে — মিশ্রণ।

২১। সিন্ধু-সভ্যতা কোথায় গড়ে ওঠে? কোথায় কোথায় এই সভ্যতার নমুনা পাওয়া গেছে? সংক্ষেপে সিন্ধু-সভ্যতার একটি বিবরণ দাও।

২২। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার নগর-পরিকল্পনা কেমন ছিল?

২৩। সিন্ধু অঞ্চলের লোকেদের প্রধান প্রধান খাদ্য কি ছিল?

২৪। সিন্ধু অঞ্চলের শিল্পকলার একটি বিবরণ দাও।

২৫। সিন্ধু অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বিবরণ দাও।

২৬। সিন্ধু অঞ্চলের উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কি জান?

২৭। সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা কটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? কিভাবে এই শ্রেণী-বিভাগের কথা জানতে পারা যায়?

২৮। সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কে আবিষ্কার করেন? মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা কোথায় অবস্থিত? (খ) সিন্ধু অঞ্চলের লোকেদের কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল?

(গ) সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা কি কি পূজা করত? (ঘ) কি কি কাজে সীলমোহর ব্যবহার হত? (ঙ) অলঙ্কার সুন্দর করার জন্য সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা কি কি ব্যবহার করত?

২৯। সঠিক উত্তরের পাশে এই '√' দাও :—

(ক) মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় গরুর গাড়ির প্রচলন ছিল/ছিল না। (খ) চান্হু-দারোতে মাটির তৈরি জিনিসপত্রের কারখানা ছিল/ছিল না। (গ) কাঁচশিল্পের নমুনা মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত হয়নি/হয়েছে। (ঘ) সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা মাতৃপূজা করত/করত না।

৩০। চীন দেশের যে-সব অঞ্চলে প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠে তার একটি বিবরণ দাও।

৩১। প্রাচীন চীন দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৩২। বন্যা সম্পর্কে চীনের পৌরাণিক কাহিনীটি লেখ।

৩৩। নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল?

৩৪। নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতায় মানুষের সামাজিক জীবন কেমন ছিল?

৩৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) মিশরের সভ্যতা — দান। (খ) মেসোপোটামিয়ার সভ্যতা — ও — দান। (গ) মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা — দান। (ঘ) চীনের সভ্যতা — ও — দান। (ঙ) প্রাচীনকালের সভ্যতার আর একটি বৈশিষ্ট্য —।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ-যুগের সমাজ

১ম পাঠ : লোহার আবিষ্কার, ব্যবহার; সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার—তাম্র-ব্রোঞ্জ-যুগের পরের যুগ লৌহ-যুগ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকরা প্রাচীনকালের ইতিহাসকে প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নব্য-প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ,

ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগে ভাগ করেন। এই বিভাগকে কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। কারণ প্রাচীন প্রস্তর যুগের কিছু কিছু রীতি-নীতি পৃথিবীর বহু অঞ্চলে এখনও প্রচলিত। আমাদের আধুনিক সভ্যতার অনেক কিছুই প্রাচীন-প্রস্তর, নব্য-প্রস্তর, তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের কাল থেকেই সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আজও লৌহ-যুগের শেষ হয়নি। লোহার ব্যবহার আমাদের জীবনে আরও বেড়ে চলেছে।

সম্ভবত টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরের লোকেরাই প্রথম লোহা আবিষ্কার করে। ধীরে ধীরে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরের দেশগুলোতে লোহার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। কি ক'রে প্রথম লোহার আবিষ্কার হয় তা জানা যায়নি। তবে মনে হয় আকাশ থেকে মাটিতে ছিটকে-পড়া উল্কাপিণ্ড থেকেই মানুষ প্রথম লোহার খোঁজ পায়। মিশরে চার হাজার খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের একটি সমাধি-মন্দিরের মধ্যে পুঁতির মত সোনার দানার সঙ্গে লোহার দানাও পাওয়া গিয়েছে। তবে পনের-শ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর পাশের অঞ্চলে শিল্পের প্রয়োজনে দিনেভের পূর্বদিকের পাহাড় এলাকায় লোহা তৈরির কাজ শুরু হয়। কৃষ্ণ সাগরের তীরে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের লোকেরাও প্রচুর লোহা তৈরি করত। এই লোহার অধিকাংশই পশ্চিম-এশিয়া, মিশর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রপ্তানি করা হত। ধীরে ধীরে লোহার ব্যবহার এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ব্রোঞ্জের বদলে লোহার ব্যবহার করতে শুরু করে। ব্রোঞ্জের তুলনায় লোহা দামে সস্তা এবং অনেক বেশি পাওয়া যেত বলে সব সভ্যদেশেই লোহার চাহিদা দ্রুত বেড়ে যায়। এই সময় থেকে ব্রোঞ্জ ও পাথরের বদলে লোহার অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরি হতে থাকে। যুদ্ধের রথ, জাহাজ এবং বাড়িঘর সাজানোর জন্যও লোহার ব্যবহার বেড়ে যায়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন – লোহার আবিষ্কারের পর মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। তামা ও ব্রোঞ্জ মূল্যবান ধাতু। সেজন্য এদের ব্যবহার ছিল সাধারণত সমাজের পয়সাওয়ালা ও ক্ষমতাশালী উঁচু শ্রেণীর লোকের মধ্যে। কিন্তু তামা বা ব্রোঞ্জের তুলনায় লোহা অনেক সস্তা এবং পাওয়া যেত অনেক সহজে। ফলে সাধারণ লোকও লোহার নানা জিনিসপত্র ব্যবহার করতে পারত। লোহার বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করাও অনেক সহজ হয়ে যায়। সেজন্য শাসকরা লোহার অস্ত্রে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারত। আধুনিক মানুষের সমাজের অনেক কিছুই লোহা আবিষ্কারের পর থেকে সমানভাবে চলে আসছে।

লোহা আবিষ্কৃত হওয়ায় অর্থনৈতিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। লোহা আবিষ্কারের ফলে ব্যাপকভাবে শিল্পের কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। এ-কথা সত্যি যে, লোহা আবিষ্কারের জন্য মানুষ আধুনিক যুগে এসে পৌঁছোতে পেরেছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ, নতুন নতুন সাম্রাজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সব-কিছুরই পিছনে লোহার কম বা বেশি প্রভাব আছে।

● ১। মনে হয় আকাশ থেকে মাটিতে ছিটকে-পড়া উল্কাপিণ্ড থেকে মানুষ প্রথম লোহার খোঁজ পায়।

২। লোহার আবিষ্কারের ফলে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়।

২য় পাঠ ঃ রাজার সৃষ্টি

প্রাচীনকালে প্রত্যেকটি সভ্যদেশেই রাজ্য শাসন করত পুরোহিতরা। পুরোহিতরাই জনসাধারণকে বাসস্থান, কৃষি, পশুপালন ও নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিত। আবার মানুষের মনের ভয়, আশা-আকাঙ্ক্ষার সুযোগ নিয়ে পুরোহিতরা তাদের ক্ষমতা বজায় রাখত।

প্রাচীন সুমেরের সব শাসকই পুরোহিত ছিল। প্রধান পুরোহিতই রাজার সম্মান পেত। কিন্তু পুরোহিতদের অনেক দুর্বলতা ছিল। বিশেষ করে আক্রমণকারীর হাত থেকে দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। নিজেদের দেব-দেবী এবং ধর্ম সম্পর্কেও তারা অত্যন্ত গোঁড়া ছিল। পুরোহিতদের সামরিক দুর্বলতা এবং ধর্মের গোঁড়ামির জন্য ধর্মের প্রভাব-মুক্ত রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। বাইরের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য দেশের লোক বা পুরোহিতরা কোন একজন উপযুক্ত লোকের উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব দিতে বাধ্য হয়। এই ব্যক্তিই সেনাবাহিনীর সাহায্যে ধীরে ধীরে দেশের ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেয়। রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে এবং ভালভাবে শাসনের কাজ চলে সেজন্য রাজা একদল কর্মচারীও নিযুক্ত করে। সাধারণ লোকের কাছে ক্ষমতা বাড়াবার জন্য রাজা নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করে। কিন্তু পুরোহিতেরা কখনও সহজভাবে রাজার এই দাবি ও ক্ষমতা স্বীকার করেনি। অনেক বাদপ্রতিবাদ ও যুদ্ধের পর জনসাধারণের সমর্থন পেয়ে রাজারা তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। কোথাও কোথাও রাজা-নির্বাচনের ব্যবস্থা দেখা গেলেও সাধারণভাবে রাজপরিবারের লোকেরাই রাজার সিংহাসনে বসত।

● বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এবং দেশের ভিতরের শান্তি রক্ষার জন্য রাজা ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী

১। কিভাবে লোহার আবিষ্কার হয়? প্রাচীনকালে কোথায় কোথায় লোহা পাওয়া যেত? কি কি কাজে তখনকার দিনে লোহা ব্যবহার করা হত?

২। লোহার আবিষ্কারের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কি পরিবর্তন আসে?

৩। কিভাবে রাজা ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়?

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) আবিষ্কারের পরই কেন লোহার ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে? (খ) কারা প্রথম লোহা আবিষ্কার করে? (গ) কোন্ কোন্ দেশে পুরোহিতরা রাজার মত সন্মান পেত? (ঘ) প্রতিটি দেশে কেন রাজার প্রয়োজন দেখা দেয়?

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক. ব্যাবিলন

ব্যাবিলোনিয়া রাজ্যের রাজধানী ব্যাবিলন ইউফ্রেটিস নদীর হিল্লা শাখার তীরে, বর্তমান বাগদাদ শহর থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ব্যাবিলন নামের অর্থ ভগবানের দুয়ার। রাজা হামুরাবির সময়ে ব্যাবিলন শহর ব্যাবিলোনিয়ার রাজধানী হয়। ৬৮৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সেনকেরিব এই পুরনো ব্যাবিলন শহর ধ্বংস করে। পরে নতুন ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের সময় নেবুকাডনেজার নতুন ব্যাবিলন শহর গড়ে তোলেন। পুরনো শহরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যাবিলোনিয়া রাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এই সমৃদ্ধির জন্যই বিদেশীরা বারবার ব্যাবিলোনিয়া আক্রমণ করেছে। আক্কাদের শাসনকর্তা সারগন সমস্ত সুমের অঞ্চল একত্রিত করেন। কিন্তু পরে অ্যামোরাইটস্ নামে আর একদল বিদেশী সুমের ও আক্কাদ অধিকার করে। অ্যামোরাইটস্দের শ্রেষ্ঠ রাজা হামুরাবি ১৯৪৮ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হামুরাবি মারা যাওয়ার কয়েক বৎসর পরে ১৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে হিটাটাইটরা ব্যাবিলোনিয়া জয় করে। হিটাটাইটদের পর ব্যাবিলোনিয়া জয় করে ক্যাসাইটরা। শেষ পর্যন্ত আসিরীয়রা ব্যাবিলোনিয়া অধিকার করে। এইভাবে ব্যাবিলোনিয়ায় বহু রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়। ৬৩১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে

ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার ব্যাবিলোনিয়া জয় করেন। এই জয়ের পরে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবিলনের গৌরব চিরদিনের মত শেষ হয়ে যায়।

১ম পাঠ : চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরের ব্যাবিলোনিয়ার জমি অত্যন্ত উর্বর। এই উর্বর জমিতে প্রচুর খাদ্য-শস্য, নানারকম ফল ও বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্‌জি ফলত। বন্যার জল যাতে জমিতে ঢুকে কোন ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য তারা নানারকম ব্যবস্থা করত। খাল কেটে বন্যার বাড়তি জল সরিয়ে দেওয়া এবং জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা অনেকদিন থেকেই ব্যাবিলোনিয়ায় প্রচলিত ছিল।

পলিমাটির দেশ ব্যাবিলোনিয়ায় তামা, সোনা, রূপা পাওয়া যেত না। সেজন্য তারা এগুলো বাইরের দেশ থেকে আমদানি করত। ফলে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমদিকের বহুদেশের সঙ্গে ব্যাবিলোনিয়ার বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী ও পারস্য উপসাগরের জলপথে এই বাণিজ্য চলত। পারস্য উপসাগর পেরিয়ে দূরের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও ব্যাবিলোনিয়া বাণিজ্যের যোগাযোগ গড়ে তোলে। খাদ্যদ্রব্য, ভাল সুতার কাপড়, পশম, চামড়া ও বিভিন্ন ধরনের শিল্পসামগ্রী ব্যাবিলোনিয়া থেকে বিদেশে রপ্তানি হত। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য ব্যাবিলোনিয়ায় একদল শক্তিশালী ও ধনী বণিকের সৃষ্টি হয়। ব্যাবিলোনিয়ায় দেশের ভিতরের বাণিজ্যও খুব সমৃদ্ধ ছিল। দেশের মধ্যে বাণিজ্যের জন্য জলপথ ও স্থলপথ দুয়েরই ব্যবহার হত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগা-যোগের জন্য নৌকা ও পশু-টানা গাড়ির প্রচলন ছিল

● ১। জলসেচ এবং উর্বর জমির জন্য ব্যাবিলনে খুব ভাল চাষবাস হত।

২। ব্যাবিলনের লোকেরা পশু-টানা গাড়ি ও নৌকায় দেশের ভিতরে এবং বাইরের সঙ্গে বাণিজ্য করত।

২য় পাঠ : মন্দির ও পুরোহিত, শিল্প ও সংস্কৃতি

মন্দির ও পুরোহিত—দেবতার মন্দির কেন্দ্র করেই প্রাচীনযুগের শহর

গড়ে ওঠে। ব্যাবিলোনিয়ার লোকেরা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত। প্রত্যেক শহরের এক-একজন আলাদা আলাদা দেবতা থাকতেন। সভ্যতার প্রথম যুগে এমনি বহু দেব-দেবীর জন্য নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিত। কিন্তু পরে অবশ্য বিভিন্ন দেব-দেবীর এই সমস্যা মেটানো হয়।

ব্যাবিলোনিয়ার প্রধান দেবতা ছিলেন মার্ডুক বা বেল। রাজারা মার্ডুকের হাত ধরে সিংহাসনে বসতেন। অন্য দেবতাদের মধ্যে আকাশের দেবতা আনু, পৃথিবী. উর্বরতা ও শস্যের এন-লিল, প্রেমের দেবতা ইসটার, মৃত্যুর দেবতা নেরগল ও লিপির আবিষ্কারক নেকো বিখ্যাত। এই সব দেবতারা বিভিন্ন মন্দিরে বাস করতেন। মন্দির রোদে-পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি হত। দেব-মন্দিরের অধীনে অনেক জায়গা-জমি থাকত। পুরোহিতেরা এগুলো দেখাশোনা করত।

প্রাচীনকালে প্রায় সবদেশেই পুরোহিতেরাই দেশের শাসন চালাত। প্রত্যেকটি নগর-রাষ্ট্রের পুরোহিত নগরের শাসক, সেনাপতি ও প্রধান পুরোহিতের কাজ করত। তারাই ছিলেন নগর-দেবতার প্রতিনিধি। পুরোহিতেরাই মন্দিরের দেবতার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করত। তারাই দেবতার উদ্দেশে তর্পণ করত, শুভ বা অশুভ লক্ষণ বিচার করত, এবং ধর্মের সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়েই জনসাধারণ মন্দিরের পুরোহিতের উপর নির্ভর করত। জনসাধারণের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মন্দিরের পুরোহিতেরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াত। মাঝেমাঝে তারা জনসাধারণের মনে কিছু কিছু কুসংস্কারেরও সৃষ্টি করত।

তবে পুরোহিতেরা কেবল দেব-মন্দির নিয়েই ব্যস্ত থাকত না। পুরোহিতেরা নানাভাবে দেশের জনসাধারণের উপকার করারও চেষ্টা করত। চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রথম জন্ম দেবতাদের মন্দিরেই। নক্ষত্র দেখে তারা ঋতু পরিবর্তন ও বীজ বোনার সময়

বুঝতে পারত। শস্য সংগ্রহ, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গেও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘদিনের চর্চার ফলে পুরোহিতরা জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে ওঠে।

প্রাচীনকালে দেবমন্দিরই ছিল বিদ্যাচর্চার একমাত্র কেন্দ্র। পুরোহিতরাই ছিল একমাত্র শিক্ষিত, চিন্তাশীল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পণ্ডিত। পুরোহিতদের সাহায্য ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প কিছুই জানা সম্ভব হত না। প্রাচীনকালের অনেক স্মৃতিচিহ্নও এই সব দেব-মন্দিরে রক্ষা করা হত। দেব-মন্দিরগুলো একসঙ্গে গ্রন্থাগার, মানমন্দির, যাদুঘর ও চিকিৎসালয়ের দায়িত্ব পালন করত। আর পুরোহিতরা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে জনসাধারণের উপকার করার চেষ্টা করত।

শিল্প ও সংস্কৃতিঃ ব্যাবিলোনিয়ার দেব-মন্দিরগুলো একদিকে যেমন ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, অন্যদিকে ব্যাবিলোনিয়ার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি দেব-মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। নিপ্পুরের মন্দিরের গ্রন্থাগার ও অসুর বনিপালের গ্রন্থাগার ব্যাবিলোনায় সাহিত্যের ভাণ্ডার। চিত্রলিপির সাহায্যে পোড়া ইটের ফলকে এই সাহিত্য লেখা হয়। এই সাহিত্যের রাজপুত্র গিলগামেশের কাহিনী অত্যন্ত বিখ্যাত। ১২টি ফলকে ৩০০০ লাইনে এই কাহিনী লেখা হয়েছে। এই কাব্যে যে প্লাবনের বর্ণনা করা হয়েছে তার সঙ্গে বাইবেলের প্লাবনের বর্ণনার যথেষ্ট মিল আছে। ব্যাবিলোনিয়ার সাহিত্যে আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মের আচার-আচরণ ও যাদুবিদ্যা প্রভৃতি লেখা হয়েছে। 'পৃথিবীর মানচিত্র' ব্যাবিলোনিয়ার লোকদের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়। দুটি খোদাই-করা পাথরে নেবুকাডনেজার ইলাম জয় করার জন্য দেবতা মার্ডুককে কৃতজ্ঞতা জানান। এই লিপিতে সূর্য, চন্দ্র, শুকতারা ও বৃশ্চিক রাশির উল্লেখ আছে।

রাজা হামুরাবির যুগের ব্যাবিলোনিয়ার শিল্পকলার অনেক নমুনাই ধ্বংস হয়ে গেছে। নেবুকাডনেজারের রাজপ্রাসাদ পশ্চিম-এশিয়ার

স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নেবুকাডনেজারের যুগে মিশরের অনুকরণে তৈরি দুটি সারিতে সাজানো সিংহের মূর্তিগুলো শহরের প্রধান আকর্ষণ ছিল। রাজপ্রাসাদের শূন্যোদ্যান পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের একটি। পাথরের উপর চিত্র খোদাই করায় ব্যাবিলোনিয়ার লোকদের নিপুণতা ছিল। হাতির দাঁতের কাজেও তারা ছিল দক্ষ।

●১। প্রাচীনকালে ব্যাবিলোনিয়ার পুরোহিতরা দেশশাসন ও দেবতার পূজা করলেও, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও করত।

২। দেব-মন্দিরগুলি ছিল প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। শিল্পেও ব্যাবিলোনিয়া খুব উন্নত ছিল।

৩য় পাঠঃ হামুরাবির প্রচলিত আইন, সামাজিক অবস্থা

হামুরাবির আইন—ব্যাবিলোনিয়ার রাজা হামুরাবি এরেক ও ইসিন জয় করেন। রিমসিম ও ইলামের রাজাও তাঁর কাছে পরাজিত হন। আসিরিয়াও তাঁর সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। তবে রাজ্য জয়ের চেয়ে আইনের সার-সংগ্রহ করাই রাজা হামুরাবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনিই পৃথিবীতে প্রথম আইন রচনা করেন। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে দেশের প্রচলিত সমস্ত আইন তিনি সঙ্কলন করেন এবং যুগোপযোগী করে তোলার জন্য তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করেন। ৮ ফুট লম্বা একটি পাথরের স্তম্ভের উভয় দিকে হামুরাবির আইনের সার-সংগ্রহ খোদাই করা হয়। বর্তমানে এই স্তম্ভটি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আছে। প্রাচীন যুগেই ব্যাবিলোনিয়ার সভ্যতা যে কত উন্নত ছিল হামুরাবির আইন থেকে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

হামুরাবির আইন-সঙ্কলনে প্রাচীনকালের অনেক প্রথাই রক্ষা করা হয়। অপরাধী ধরার জন্য আগুন, জল ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করার ব্যবস্থাও তিনি রাখেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মানের পার্থক্যের জন্য বিচারের ব্যাপারেও পার্থক্য করা হয়। আগে দেবতার মন্দিরের সম্পত্তি চুরি করার জন্য অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। হামুরাবি প্রাণদণ্ডের বদলে অন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তবে দেবতার মন্দিরে

চুরির অপরাধে যে যে শাস্তি ভোগ করতে হত, সাধারণ লোকের জিনিস চুরির অপরাধে তার চাইতে অনেক কম শাস্তি পেতে হত। আগে কোন কোন অপরাধের জন্য অপরাধীর চোখ উপড়ে নেওয়া হত, আর হাত বা পা কেটে দেওয়া হত। হামুরাবি এই আইন বদলান। দেহের কোন অংশ কেটে নষ্ট করার বদলে টাকা-পয়সা জরিমানার ব্যবস্থা করেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রাচীনকালের অনেক কঠোর ও অমানুষিক আইনের পরিবর্তন করে তিনি সভ্য সমাজের উপযুক্ত আইন প্রচলন করেন।

সামাজিক অবস্থা—হামুরাবির আইনের সারসংগ্রহ থেকে জানা যায় যে, তখনকার দিনে ব্যাবিলোনিয়ার সমাজে তিনটি শ্রেণী ছিল। এই তিনটি শ্রেণী অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও দাস। সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মানেও এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। আইনের চোখেও এই শ্রেণী তিনটি সমান ছিল না। তবে ব্যাবিলোনিয়ায় দাসদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। কোন কোন সময় দাসেরা মুক্তিও পেত।

● ১। রাজা হামুরাবি পৃথিবীতে প্রথম আইন সঙ্কলন করেন।

২। রাজা হামুরাবির সময় সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা আইন ছিল।

খ. মিশর-সাম্রাজ্য

১ম পাঠ : মিশরের উপনিবেশ

রাজা মেনিসের আমলে উত্তর ও দক্ষিণ মিশর এক হয়ে যায়। তারপর চতুর্থ রাজবংশের সময়ে মিশরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মিশরের রাজনীতিতে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়। চতুর্থ রাজবংশ থেকে পঞ্চদশ রাজবংশের সময় পর্যন্ত এই ঝগড়া সমানভাবে চলতে থাকে। এর ফলে দেশের ক্ষমতাশালী জমিদাররা নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পায়। সেজন্য এই যুগকে মিশরের ইতিহাসে সামন্ত-যুগ বা জমিদারদের যুগ বলা হয়। এই সময়ের ফারাওদের মধ্যে একমাত্র

দ্বিতীয় পেপীই দক্ষতার সঙ্গে দেশ শাসন করেন। তাঁর দীর্ঘ নব্বই বছরের শাসনে সামন্তদের ক্ষমতা অনেক কমে যায় এবং ফারাওর ক্ষমতা বেড়ে যায়। তিনি মিশরের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর হিকসস্ নামে একদল যাযাবর লোক মিশর দখল করে। বিদেশীরা তাদের দেশ দখল করার পর মিশরের লোকেরা নিজেদের ঝগড়াঝাঁটি ভুলে গিয়ে সকলে এক হয়ে বিদেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। বিদেশীরা শীঘ্রই পরাজিত হয়। বিদেশী-আক্রমণের ফলেই মিশরীরা আবার এক হয়ে যায়।

হিকসস্‌দের সঙ্গে যুদ্ধের পরে মিশরের সমৃদ্ধি আবার বেড়ে যায়। নতুন রাজবংশ মিশরের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে এবং কাছাকাছি অঞ্চল জয় করতে চেষ্টা করে। নতুন করে সেনাবাহিনী সাজিয়ে মিশর ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত অধিকার করে। নতুন অঞ্চলে তাদের অনেক উপনিবেশও গড়ে ওঠে। এই সাম্রাজ্য জয়ের ফলে ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ার সঙ্গে মিশরের যুদ্ধ শুরু হয় এবং এই যুদ্ধ অনেকদিন ধরে চলে। প্রথম দিকে এই যুদ্ধে মিশর জয়ী হতে থাকে। তৃতীয় থটমিস ও আমেনফিস ইথিয়োপিয়া থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল জয় করেন। উনবিংশ রাজবংশের ফারাও দ্বিতীয় রামেসিসের সময়ে মিশরের সাম্রাজ্য আরও বেড়ে যায়। দ্বাবিংশতিতম রাজবংশের ফারাও শিশক আসিরিয়ার সলোমনের মন্দির লুট করেন। সম্ভবত শিশকের আমলেই ফিলিস্তিয়া মিশরের অধিকারে আসে। কিন্তু শিশকের রাজত্বের কিছুদিন পরেই বিদেশীরা মিশর জয় করে। এইসব বিদেশী রাজবংশের রাজত্বের সময়ে মিশরের গৌরবময় যুগ শেষ হয়ে যায়।

● রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার পর মিশর উপনিবেশ গড়ে তোলে।

২য় পাঠ: পুরোহিতদের প্রতিপত্তি

প্রাচীনকালের অন্যান্য সভ্যদেশের মত মিশরের পুরোহিতরাও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। ফারাওদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বেড়ে

যাওয়ার পরও এই অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। পুরোহিতরা ছিল রাজার সব চেয়ে বড় সমর্থক। সমাজে যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেজন্য তারা স্বেচ্ছায় রাজাকে সাহায্য করত। অন্য দিকে ফারাওরা নিজেদের দেশের প্রধান পুরোহিত এবং ঈশ্বরের সন্তান বলে মনে করত। এজন্য রাজা ও পুরোহিতদের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পুরোহিতরা এই সম্পর্কের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। ধর্ম-আচরণে নানাধরনের জটিলতা দেখা দেয়। দেবতার উপাসনার জন্য যাদুবিদ্যা ও ধর্মীয় পূজাপার্বণে অভিজ্ঞ একদল লোকের প্রয়োজন দেখা দেয়। যাদুবিদ্যা ও ধর্মের আচরণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরোহিতরাই একাজ করত। কোন নিয়ম না থাকলেও পুরোহিতদের পদ তাদের বংশধররাই পেত। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দেব-দেবীতে বিশ্বাস ও ভক্তি বেড়ে যায়। এর জন্য এবং ফারাওদের উদারতার সুযোগে পুরোহিতরা দেশের জমিদারদের চেয়ে এমন কি ফারাওদের চেয়েও অনেক বেশি ধনী ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ-করা খাদ্যের জন্য পুরোহিতদের খাদ্যের কোন অভাব হত না। দেবতাদের মন্দির ছিল তাদের নিরাপদ সুন্দর বাসস্থান। মন্দিরের সম্পত্তিও হয়ে যায় তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পরিশ্রমের কোন কাজ এবং সেনা-বিভাগে কাজ করতে ও কর দিতে পুরোহিতরা বাধ্য ছিল না। ফলে সমাজে তাদের স্থান হয় অত্যন্ত সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ। মিশরের শিক্ষার সমস্ত দায়িত্বও তাদের উপর ছিল। এই সবের জন্য মিশরের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পুরোহিতদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি।

ফারাওদের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতদের ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। জয়-করা নতুন রাজ্য থেকে লুট-করা অর্থের বেশির ভাগই দেব-মন্দিরে জমা হত। মিশরের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরগুলো দ্রুত তাদের বিষয়সম্পত্তি বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পায়। ফারাও তৃতীয়

রামেসিসের আমলে দেবমন্দির ও পুরোহিতরা সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। এই সময় মন্দিরের অধীনে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল ১০৭,০০০—মিশরের মোট লোকসংখ্যার তের ভাগের একভাগ। মন্দিরের জমির পরিমাণ ছিল, ৭৫০,০০০ একর—মিশরের মোট চাষের জমির সাত ভাগের একভাগ। গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ছিল ৫০০,০০০। দেব-মন্দির ছিল মিশর ও সিরিয়ার ১৬৯-টি শহরের কর আদায়ের মালিক। ফারাও তৃতীয় রামেসিস দেবতা আমনের মন্দিরের পুরোহিতদের উপর খুব খুশি ছিলেন। তিনি উদার হাতে অনেক ধন-সম্পদ, ৩২,০০০ কিলোগ্রাম সোনা ও দশ লক্ষ কিলোগ্রাম রূপা তাদের দান করেন। তাছাড়া তিনি প্রতি বৎসর ১৮৫,০০০ বস্তা খাদ্য-শস্যও পুরোহিতদের দান করতেন। কিন্তু তৃতীয় রামেসিসের রাজত্বের সময়ে রাজভাণ্ডারে টাকার অভাব দেখা দেয় এবং অভাবের দরুন রাজ-কর্মচারীরা নিয়মিত বেতনও পেত না। দেব-মন্দিরের এত অর্থ-সংগ্রহের জন্য সাধারণ লোকের অভাব-অনটন অনেক বেড়ে যায়। এমন কি তাদের না খেয়েও দিন কাটাতে হত।

পুরোহিতদের ক্ষমতা বাড়ার ফলে অন্যান্য দেশে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় মিশরেও তাই হয়েছিল। শীঘ্রই রাজ-শক্তির সঙ্গে পুরোহিত-শক্তির বিবাদ দেখা দেয়। বিবাদে ফারাও হার মানেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পুরোহিতদের নির্দেশেই চলতে থাকেন। পরে দেবতা আমনের মন্দিরের পুরোহিত সিংহাসনে বসেন। ধর্মের নামেই রাজ্য পরিচালিত হত। পুরোহিতদের এই ধরনের দেশশাসনের জন্য জাতীয় জীবনের উন্নতি বন্ধ হয়ে যায়। সমাজে নানা কুসংস্কার দেখা দেয় এবং পুরোহিতের নির্দেশে চলতে চলতে মিশর ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। মিশরের এই দুর্বলতা ও মন্দিরের জমানো বিশাল সম্পত্তির লোভে বিদেশীরা মিশর আক্রমণ শুরু করে এবং অতি সহজেই তারা মিশর দখল করে নেয়।

● মিশরের পুরোহিতদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে খুব বেড়ে যায়। পরে তারা রাজার ক্ষমতাও অধিকার করে।

গ ইরান

১ম পাঠ : পারস্যের উত্থান

বর্তমানকালের ইরান কিছুদিন আগেও পারস্য নামে পরিচিত ছিল। মধ্যযুগে ফারসী শব্দ এরান থেকে ইরান নাম হয়েছে। এই দেশের প্রাচীন নাম আরিয়ানাম অর্থাৎ আর্যদের দেশ। পারস্ বা পারসীকরা প্রাচীন আরিয়ানামের আর্যজাতির একটি শাখা। এই অঞ্চলের আর্যজাতির আর একটি শাখা ছিল মিডিস। মিডিস ও পারসীকদের দুটি পৃথক্ রাজ্য ছিল।

মিডিস ও পারসীক দুই গোষ্ঠীই সুস্থ, সবল, কর্মঠ ও কৃষিকাজে দক্ষ ছিল। তাদের ঘোড়া ছিল খুব সুন্দর ও তেজী। এই দুই গোষ্ঠীর লোকেরাই বীর এবং সাহসী যোদ্ধা ছিল। তাদের প্রাচীনকালের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায়নি। পারস্যরাজ কাইরাস ৫৪৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মিডিস জয় করার পরেই এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস ভালভাবে জানা যায়। ইতিহাসের একজন ব্যক্তিত্বশালী সম্রাট কাইরাস মিডিস ও পারসীক এই দু'-দেশই শাসন করতেন। এই সময়ের ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ার শাসকদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রজাদের খুব ভালবাসতেন। প্রতিবেশী প্রায় সব রাজ্য জয় করে কাইরাস লিডিয়াব দক্ষিণ থেকে পারস্যের পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল অধিকার করেন। ৫২৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কাইরাসের পরের সম্রাট ক্যাম্বিসিস ৫২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মিশর জয় করেন। এই সময় পারস্য-রাজ্যের সীমানা ছিল ভারতের সীমানা থেকে আফ্রিকার ইথিয়োপিয়া ও নিউবিয়া পর্যন্ত। ক্যাম্বিসিসের মৃত্যুর পর দারায়ুস সিংহাসনে বসেন। তিনি পাঞ্জাব অধিকার করেন। ৪২৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ৩৩১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করেন।

পারসীকদের আগে পৃথিবীর আর-কোন জাতি এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য গড়তে পারেনি। এই বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে

বিভক্ত ছিল। ক্ষত্রপ বা প্রদেশের শাসনকর্তারা শাহের প্রতিনিধি হিসেবে প্রদেশগুলো শাসন করত। ক্ষত্রপরা দক্ষ শাসক ছিল। তাদের সুশাসনে গ্রীক, আসিরীয়, মিশরীয়, হিব্রু ও ফিনিশীয় প্রজারা মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট ছিল। ভাষা, ধর্ম ও অর্থনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজারা অনেক স্বাধীনতা পেত।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সাম্রাজ্যে বহু নতুন নতুন রাজপথ তৈরি হয়। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে রাজধানী সুসার যোগ ছিল। 'রাজার চোখ ও কান নামে পরিচিত' একদল দক্ষ কর্মচারী রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সংবাদ রাজাকে দিত। এদের সাহায্যে রাজা সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসন করতেন।

● ইরান বা পারস্যই প্রাচীন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

২য় পাঠ : জরথুস্ত্র

আগে ইরানের লোকেরা সূর্য, চন্দ্র, বরুণ (জল), অগ্নি, পবন (বাতাস) প্রভৃতি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা হিসেবে পূজা করত। পরে এর মধ্যে কুসংস্কার, যজ্ঞ, পশুবলি ও নানা অনাচার দেখা দেয়। জরথুস্ত্র বহু দেবতার পূজার বদলে 'ঈশ্বর এক' এই মত প্রচার করেন। জরথুস্ত্র-প্রচারিত এই ধর্ম 'জরথুস্ত্র-ধর্ম' নামে পরিচিত। তাঁর এই এই ধর্মমতের প্রাচীন নাম মজদা-য়শন বা মজদা ধর্ম। এই ধর্ম-মতের অর্থ—আহুর মজদা নামে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস। মহাপুরুষ জরথুস্ত্র সম্ভবত এক হাজার খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ইরানের মিডিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন।

পনের বৎসর বয়সে জরথুস্ত্র উশিদারায়ণ পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা শুরু করেন। প্রায় পনের বৎসর তপস্যা করার পর ঈশ্বর আহুর-মজদা তাঁর সামনে দেখা দেন। তারপর তিনি 'ঈশ্বর এক' এই মত ইরানে প্রচার করতে আরম্ভ করেন। ধর্ম প্রচার করার সময় তাঁকে নানা ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। দীর্ঘদিন তিনি ব্যাকট্রিয়া প্রদেশে

ধর্মপ্রচার করেন। জরথুস্ত্রের সাতাত্তর বছর বয়সে একজন গোঁড়া পুরোহিত তাঁকে হত্যা করে।

ইরানের ধর্মে জরথুস্ত্র এক বিরাট পরিবর্তন আনেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে সৎ এবং অসৎ এই দুটি শক্তিই আছে। সৎ শক্তির দেবতা আহুর-মজদা, আর অসৎ শক্তির প্রতিনিধি আহিরমান। কিন্তু মানুষের সবসময়ই সৎ শক্তিকে বেছে নেওয়া উচিত। এই সৎ শক্তিই মানুষকে সত্য, ধর্ম, পবিত্রতা, জ্ঞান, নীতি, দয়া, অতিথি-সেবা এবং মৃতের প্রতি সম্মান করতে শেখায়। সেজন্য সৎ সব-কিছুর উপর জরথুস্ত্র বিশেষ গুরুত্ব দেন। সৎকাজের জন্য মৃত্যুর পর মানুষ আহুর-মজদার আশ্রয় পায় এবং অসৎ কাজের জন্য মানুষ আহিরমানের চাকর হয়। জরথুস্ত্র-ধর্মের পবিত্র শাস্ত্র-গ্রন্থের নাম জেন্দ-আবেস্তা। এই শাস্ত্রের সাহায্যেই জরথুস্ত্র তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। জরথুস্ত্র-ধর্ম পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। পারস্যের সমাজ-গঠনেও এই ধর্মমতের প্রভাব খুব গভীর।

● জরথুস্ত্র ইরানে এক নতুন ধর্ম প্রচার করেন। এই ধর্মের নাম জরথুস্ত্র-ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থের নাম জেন্দ-আবেস্তা।

ঘ. ইহুদি

১ম পাঠঃ হিব্রুজাতি

ইউফ্রেটিস নদীর তীরে উর অঞ্চলে সেমেটিক-গোষ্ঠীর একদল যাযাবর বাস করত। পশুপালনই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। এই জাতিটি হিব্রু বা ইহুদি নামে পরিচিত। গৃহপালিত পশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সন্ধানে তারা ব্যাবিলোনিয়া রাজ্যে স্থায়িভাবে বাস করার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাবিলোনিয়ার সৈন্যের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তারা পশ্চিম দিকে এগুতে থাকে। নতুন কোন অঞ্চলে স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অনেক দেশ ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত তারা মিশরে আশ্রয় পায়। প্রায় পাঁচ-শ বছর তারা মিশরে বাস করে। হিকসস্‌রা মিশর আক্রমণ করার সময় ইহুদিরা তাদের সাহায্য করে। ফলে

হিকসস্‌দের মিশর জয়ের পর তারা নিরাপদে মিশরে বাস করতে পারে। কিন্তু অনেকদিনের যুদ্ধে মিশরের লোকেরা হিকসস্‌দের পরাজিত করার পর থেকেই ইহুদিদের আবার দুর্দিন দেখা দেয়। বিদেশীদের সাহায্য করার অপরাধে ইহুদিদের ক্রীতদাস করা হয়। তাদের রাজপথ ও পিরামিড তৈরির কাজে লাগানো হয়। মিশরের সৈন্যরা সবসময় তাদের সতর্ক পাহারায় রাখত বলে ইহুদিদের মিশর ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

● ইহুদিদের কোন স্থায়ী আস্তানা ছিল না। তারা অনেকদিন মিশরে বাস করে। পরে তাদের ক্রীতদাস করা হয়।

২য় পাঠ : মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদিদের পলায়ন, দাসত্ব-মুক্তি

ইহুদিরা অনেকদিন মিশরে ক্রীতদাসের জীবন কাটায়। তাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। এই কষ্টের জীবন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন নেতার অভাবে তাদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। খ্রীষ্ট জন্মাবার ১২০০ শ বৎসর আগে তাদের এতদিনের আশা সফল হয়। মোজেস নামে একজন তরুণ ইহুদি নেতা গোপনে গোপনে সমস্ত ইহুদিদের একত্রিত করেন। তিনি বলেন দুধ ও মধু-ভরা ঈশ্বরের তৈরি এক সুন্দর দেশে তাদের নিয়ে যাবেন। সেখানে গেলেই তারা ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্তি পাবে। মোজেসের পরামর্শে সৈন্যদের এড়িয়ে ইহুদিরা মিশর ছেড়ে পালায়। নানাদেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত ১১৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তারা প্যালেস্টাইনে এসে পৌঁছায়। জর্ডন নদীর তীরের এই জায়গাটা তাদের খুব পছন্দ হয়। এখানেই তারা বসবাস করতে থাকে। এতদিনে তাদের ক্রীতদাসের দুঃখের জীবন শেষ হল। মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদিদের মিশর ছেড়ে পালানোর কাহিনী বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে।

● মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদিরা মিশর থেকে প্যালেস্টাইনে পালিয়ে আসে। তারা ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্তি পায়।

অনুশীলনী

১। ব্যাবিলনের চাষবাস সম্বন্ধে লেখ। তখন সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা কেমন ছিল?

২। ব্যাবিলনের মন্দির ও পুরোহিত সম্বন্ধে কি জান?

৩। সে-সময়ের ব্যাবিলনের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে লেখ।

৪। রাজা হামুরাবি কোথাকার রাজা ছিলেন? তাঁর প্রচলিত আইন সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখ। এই সময়ের সমাজের অবস্থা কেমন ছিল?

৫। মিশরের উপনিবেশ গড়ার কাহিনী লেখ।

৬। মিশরের পুরোহিত সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। পারস্যের উত্থান সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখ।

৮। জরথুস্ত্র কে ছিলেন? তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে কি জান?

৯। ইহুদি কাদের বলে? তারা কোথায় বাস করত?

১০। মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদিদের পলায়ন সম্বন্ধে লেখ।

১১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) ব্যাবিলন শহর কোথায় ছিল? (খ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের জন্য ব্যাবিলনের লোকেরা কি ব্যবহার করত? (গ) ব্যাবিলোনিয়ার প্রধান দেবতা কে ছিলেন? অন্যান্য কয়েকজন দেবতার নাম বল। (ঘ) ব্যাবিলনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল কোথায়? (ঙ) ব্যাবিলোনিয়ার সাহিত্যের বিখ্যাত কাহিনীর নাম কি? (চ) রাজা হামুরাবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি? (ছ) আগে ব্যাবিলনে দেবতার মন্দিরে চুরির জন্য কি করা হত? (জ) কোন্ যুগকে মিশরের ইতিহাসে জমিদারের যুগ বলা হয়? (ঝ) কে সলোমনের মন্দির লুট করেন? (ঞ) পারস্যের কোন্ সম্রাট মিশর জয় করেন? (ট) জরথুস্ত্র ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থের নাম কি? (ঠ) ইহুদিদের কেন ক্রীতদাস করা হয়? (ড) ইহুদিরা পালিয়ে কোথায় যায়?

১২। ঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও :—

(ক) পলিমাটির দেশ ব্যাবিলোনিয়ায় তামা, সোনা, রূপা পাওয়া যেত/যেত না। (খ) নক্ষত্র দেখে পুরোহিতরা ঋতুপরিবর্তন ও বীজ বোনার সময় বুঝত/বুঝত না। (গ) রাজা হামুরাবি পৃথিবীতে প্রথম আইন রচনা করেন/করেন না। (ঘ) তখনকার ব্যাবিলোনীয় সমাজে তিনটি/চারটি শ্রেণী ছিল। (ঙ) দ্বিতীয় পেপী দেশের বিশৃঙ্খলা দূর করেন/করেন না। (চ) সম্রাট কাইরাস মিডিস ও পারসীক এই দু'দেশই শাসন করতেন/করতেন না।

সপ্তম অধ্যায়

গ্রীস

১ম পাঠ ঃ গ্রীস-সভ্যতায় ক্রীটের প্রভাব

গ্রীসদেশের তিন দিকই সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। দীর্ঘ সমুদ্রতীর এবং অনেক বন্দর থাকায় প্রাচীনকাল থেকে সহজেই বাইরের জগতের সঙ্গে গ্রীসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এশিয়া মাইনর, মিশর প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যই গ্রীসের লোকের মধ্যে স্বাধীনতা, জল-পথে বাণিজ্য এবং নগর-রাষ্ট্র গঠনের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও গ্রীকরা নতুন চিন্তার পরিচয় দেয়।

গ্রীস উপদ্বীপের দক্ষিণে ঈজীয় সাগরে ক্রীটদ্বীপ। পূর্বদিকে মিশর ও পশ্চিম-এশিয়ার প্রাচীন সভ্যদেশগুলো ও উত্তর-গ্রীসের সঙ্গে ক্রীটের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নব্য-প্রস্তর যুগেই ক্রীটে একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠে। পরে মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ার সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য ক্রীটের সভ্যতারও দ্রুত উন্নতি হয়। কৃষি, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পোড়ামাটির শিল্প, ছোট ছোট যন্ত্র তৈরি, সুতোর কাপড় বোনা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়েই ক্রীটের লোকেরা খুব দক্ষ ছিল। মাটি খুঁড়ে ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতার অনেক নমুনা পাওয়া গেছে। এক ধরনের লিখন-পদ্ধতিও তারা আবিষ্কার করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এগুলো পড়া সম্ভব হয়নি। ক্রীট কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ক্রীটের দুর্বলতার সুযোগে গ্রীকরা ক্রীট অধিকার করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ক্রীটের সভ্যতা তাদের প্রভাবিত করে।

ক্রীটের সভ্যতাকে ক্রীটান বা মিনোয়ান সভ্যতা বলা হয়। মিনোয়ান সভ্যতা ধীরে ধীরে উত্তরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রীক উপদ্বীপ, ট্রয় ও অন্যান্য দ্বীপের লোকের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। গ্রীসের লোকেরা প্রথমে ক্রীটের সভ্যতার অনেক কিছু ধ্বংস করে। পরে তারা ক্রীটের উন্নত ধরনের সভ্যতার মূল্য বুঝতে পেরে ক্রীটের সভ্যতা নিজেদের বলে গ্রহণ করে।

● গ্রীসরা ক্রীট দ্বীপ জয় করে। কিন্তু ক্রীটের উন্নত সভ্যতা তাদের প্রভাবিত করে।

২য় পাঠ : হোমারের যুগ

প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার অনেক কথা অন্ধকবি হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি মহাকাব্য দুটিতে পাওয়া যায়। এই দুই মহাকাব্যে যে-যুগের কথা বলা হয়েছে তাকে হোমারের যুগ বলে। সম্ভবত খ্রীষ্ট-পূর্ব নবম শতাব্দীতে হোমারের জন্ম। অনেকের মতে হোমার গ্রীস ও ট্রয়ের যুদ্ধের প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী সঙ্কলন করে একটি সুন্দর কাব্যে রূপ দেন। ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের ছেলে প্যারিস গ্রীসের স্পার্টার রাজা মেনিলিয়সের রানী হেলেনকে চুরি করে। হেলেনকে উদ্ধার করার জন্য গ্রীকরা ট্রয় আক্রমণ করে। দশ বছর যুদ্ধের পর গ্রীকরা ট্রয় জয় করে হেলেনকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এই কাহিনীই ইলিয়ড মহাকাব্যে বর্ণনা করা হয়েছে। ট্রয়ের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গ্রীকদের অন্যতম সেনাপতি ইথাকার রাজা ওডিসিউসের বা ইউলিসিসের নিজের রাজ্যে ফিরে আসার কাহিনী ওডিসির বিষয়বস্তু।

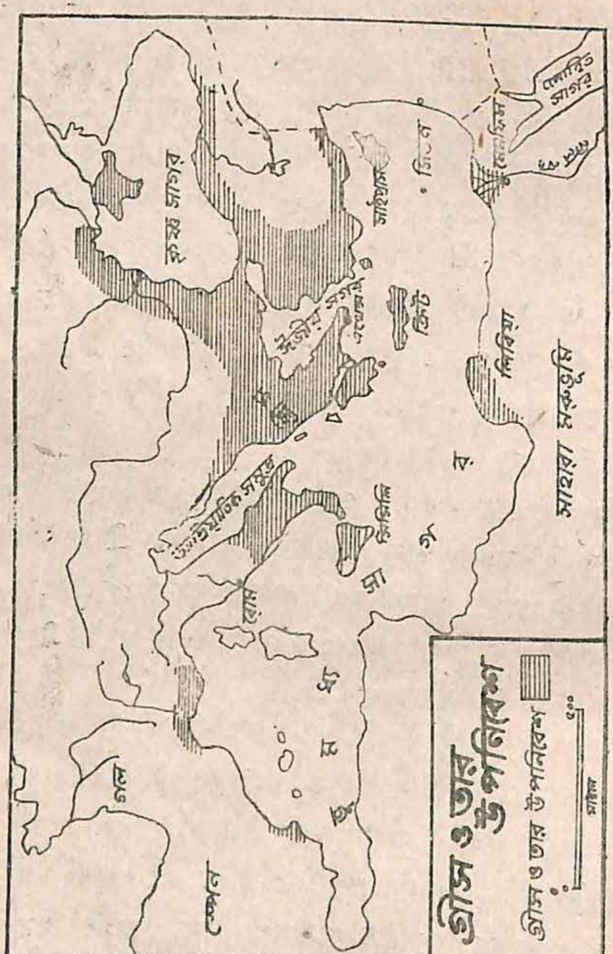
রাজা, রাজার সভাসদ্ ও বীরযোদ্ধাদের কাহিনীই ইলিয়ড ও ওডিসিতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। তাহলেও গ্রীসের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অনেক কথাই এই দুই মহাকাব্যে পাওয়া যায়।

● হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ড ও ওডিসি থেকে প্রাচীন গ্রীসের অনেক কথা জানা যায়।

৩য়, পাঠ : নগর-রাষ্ট্র, উপনিবেশ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান

নগর-রাষ্ট্র— নগর-রাষ্ট্রের সাধারণত তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রাষ্ট্রের আয়তন ছোট। একটি প্রধান নগর এবং তার পাশের অঞ্চল নিয়েই নগর-রাষ্ট্রের সৃষ্টি। এথেন্স, স্পার্টা ও করিন্থ এই ধরনের নগর-রাষ্ট্রের উদাহরণ। এথেন্স বা করিন্থে এক্রোপোলিসের (দুর্গের) মত পাঁচিল-ঘেরা জায়গায় শহরের শাসনকেন্দ্র ছিল। শাসনের কাজে নগর-রাষ্ট্রের সব স্বাধীন নাগরিকেরা অংশ নিত।

তাছাড়া চারটি ধাপে গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। হোমারের মহাকাব্য থেকে জানা যায় যে, প্রথম যুগে রাজা বা দলনেতা ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে। তারপর রাজ্যের অভিজাত লোকেরা রাজার ক্ষমতা কমিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পায়। পরে গ্রীসের প্রায় সকল রাজ্যেই অভিজাত শ্রেণীর কোন একজন বিশেষ লোক শাসন-ক্ষমতা অধিকার করে। তবে



এইসব শাসকরা খুব অত্যাচারী ছিল না। তাদের আমলে গ্রীসের সাধারণ লোক সুখে ও শান্তিতেই বাস করত। তবু দেশের জন-

সাধারণ এদের পছন্দ করে না। তারা এই শাসকদের শাসনের পরিবর্তে স্বাধীন নাগরিকদের দিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করে।

উপনিবেশ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান—গ্রীস উপদ্বীপে উর্বর জমির অভাব, লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়া, দেশের শাসন পছন্দ না হওয়া, অজানা দেশ জানার ইচ্ছা প্রভৃতি কারণে গ্রীসদেশের বহু লোক নতুন নতুন জায়গায় উপনিবেশ গড়ে তোলে। কৃষ্ণ সাগরের পূর্বতীর থেকে শুরু করে আটলান্টিক সমুদ্রের তীরের স্পেনের কার্ডিজ বন্দর পর্যন্ত গ্রীক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এই সব উপনিবেশের মধ্যে এশিয়া মাইনর, সিসিলি, ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ ও স্পেনের উপনিবেশ-গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এই সমস্ত উপনিবেশের সঙ্গে গ্রীস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করত। অনেক সময় এই সকল উপনিবেশের শাসকদের গ্রীসদেশ থেকেই পাঠানো হত। ধর্ম ও সংস্কৃতির বিষয়ে এই সব উপনিবেশ গ্রীসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলত। নিজেদের দেশ ছেড়ে আসা সত্ত্বেও উপনিবেশের লোকেরা স্বদেশের কথা ভুলে যেত না। নিজেদের দেশ থেকে অনেক দূরে উপনিবেশে বাস করতে শুরু করলেও গ্রীসের লোকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সমানভাবেই চলত। গ্রীসের উপনিবেশের লোকেরা গ্রীক ভাষায়ই কথা বলত। ধর্ম এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যও তারা বজায় রাখত। মহাকবি হোমারের কাব্য সবার কাছেই সমান প্রিয় ছিল। অলিম্পাস পাহাড়ের দেবদেবীরা সমস্ত গ্রীক জাতির কাছেই সমানভাবে পূজা পেত। জিউসের মন্দিরে পূজা দেওয়ার জন্য বহুদূর থেকেও গ্রীকরা আসত। ৭৭৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সেখানেই দেবতা জিউসের সম্মানে প্রথম অলিম্পিক খেলা আরম্ভ হয়। এই খেলায় গ্রীস দেশের যে-কোন লোক যোগ দিতে পারত। ডেলফির মন্দিরের দৈববাণী জানার জন্য নানা স্থান থেকে গ্রীকরা ডেলফির মন্দিরে এসে উপস্থিত হত। এইভাবে নানাস্থানে বিভিন্ন সময়ে মিলিত হওয়ায় গ্রীকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের

যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, নগর-রাষ্ট্র, হোমারের মহাকাব্য, একই ভাষা, একই দেবতা, অলিম্পিক খেলা ইত্যাদি গ্রীক জাতির স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়। গ্রীসের লোকেরাও তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে খুব গর্বিত ছিল।

● ১। প্রাচীন গ্রীসে ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র ছিল। দেশের নাগরিকরা রাজ্যের শাসন চালাত।

২। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় গ্রীকরা এশিয়া মাইনর থেকে স্পেন পর্যন্ত উপনিবেশ গড়ে তোলে।

৩। উপনিবেশের সঙ্গে গ্রীস দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

৪র্থ পাঠ : এথেন্স ও স্পার্টা—সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

এথেন্স ও স্পার্টা গ্রীসের দুটি উল্লেখযোগ্য নগর-রাষ্ট্র। দুটি শহরের লোকেরাই ছিল গ্রীক। তারা কথা বলত গ্রীক ভাষায়। মাত্র এই দুটি বিষয়েই তাদের মধ্যে মিল ছিল। আর অন্য সব-কিছুতেই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। এথেন্সের শাসন ছিল উদার ও গণতান্ত্রিক। প্রত্যেক নাগরিককে দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হত। বাবা-মায়ের সন্তানদের ঠিকভাবে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব ছিল। অন্যদিকে সন্তানরা যাতে বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হত। এথেন্সের শাসকদের চেষ্টার ফলে দেশের জনসাধারণের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। সমুদ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার জন্য এথেন্সের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও খুব উন্নতি হয়।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সোলন নামে একজন শাসক শাসনের বিভিন্ন সংস্কার করেন। এর ফলে শিল্প ও বাণিজ্যে এথেন্সের আরও উন্নতি হয়। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪ৰ০ থেকে ৪৮০ অব্দে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ের পর এথেন্স গ্রীক-সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সময়ে ক্লেইসস্থিনিস এবং পেরিক্লিস আবার এথেন্সের শাসন সংস্কার করেন। এর পরে এথেন্সের গণতন্ত্র পুরোপুরি রূপ নেয়। তবে এথেন্সে বিদেশী,

ক্রীতদাস ও মেয়েদের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। তাহলেও এই সময় এথেন্সে শিল্প ও বিজ্ঞানের খুব উন্নতি হয়। গ্রীক সভ্যতার ইতিহাসে এথেন্সের দানই সবচেয়ে বেশি।

স্পার্টা ডোরিয়ান রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। 'হেলট' বা ক্রীতদাসদের উপর অত্যাচার করে করে স্পার্টার লোকেরা এক নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী জাতি হয়ে ওঠে। ক্রীতদাসরা যে-কোন সময়ে বিদ্রোহ করতে পারে এই ভয়ে তারা স্পার্টাকে একটি সামরিক শিবির করে তোলে। যুদ্ধই ছিল তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। জন্মের পর প্রত্যেক শিশুকে ডাক্তাররা পরীক্ষা করত। ডাক্তাররা দুর্বল শিশুদের মেরে ফেলত। সেখানে একমাত্র স্বাস্থ্যবান শিশুরই বেঁচে থাকার অধিকার ছিল। শিশুদের সাত বছর বয়স হলে সামরিক শিবিরে নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখানে কঠোর নিয়মের মধ্যে যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া হত। ত্রিশ থেকে ষাট বছর পর্যন্ত বয়সের লোকেরা যুদ্ধের কাজ করতে বাধ্য ছিল। স্পার্টার মেয়েরাও নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা করতে বাধ্য ছিল।

স্পার্টায় শাসন ছিল কঠোর। সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকেরাই শাসন চালাত। সাধারণ লোকের কোন স্বাধীনতা না থাকায় সেখানে বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, ব্যবসা-বাণিজ্য কোন্-কিছুরই উন্নতি হয়নি।

● এথেন্স ও স্পার্টা দুটিই গ্রীকদের রাজ্য হলেও দুরাজ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল।

৫ম পাঠ : স্পার্টা-এথেন্সের সম্পর্ক

পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় গ্রীক রাজ্যগুলোর নেতৃত্ব ছিল এথেন্সের হাতে। পারস্যের পরাজয়ের পর এথেন্স অনেক গ্রীক রাজ্যের উপর নিজের অধিকার বিস্তার করে। সে সব গ্রীক রাজ্যগুলোর দেশের ভিতরের শাসন এথেন্সই চালাতে থাকে। এই সময় এথেন্সের শাসক ছিলেন পেরিক্লিস। পেরিক্লিসের শাসনে প্রত্যেকটি নতুন অধিকার-করা গ্রীক-রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয় গ্রীক

জাতি এথেন্সের কর্তৃত্ব সহ্য করতে রাজি ছিল না। তা ছাড়া এভাবে এথেন্সের শক্তি বেড়ে যাওয়ায় স্পার্টা অত্যন্ত ভয় পায়। স্পার্টা এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত গ্রীস দেশের দুটি ছোট রাজ্যের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধকে পেলোপন্নিসিয়ান যুদ্ধ বলে। ৪৩১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে এই যুদ্ধ শুরু হয় এবং ৪০৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই যুদ্ধ শেষ হয়। গ্রীসের বহু রাজ্যই এই যুদ্ধের সময় স্পার্টা বা এথেন্সের দিকে থাকে।

স্পার্টার সেনাবাহিনী এথেন্সের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এথেন্সের নৌবাহিনী ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। তবে এথেন্সের কাছে হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পারস্য স্পার্টাকে নিজেদের নৌবাহিনী দিয়ে সাহায্য করে। ফলে এথেন্স বিপদে পড়ে। বিশেষত যুদ্ধের তৃতীয় বছরে এথেন্সে প্লেগের মহামারী দেখা দেয়। এথেন্সের বহু লোক এই প্লেগে মারা যায়। পেরিক্লিসও এই মহামারীতে মারা যান। পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর এথেন্সের রাজনীতিতেও জটিলতা দেখা দেয়। যোগ্য নেতার অভাবে এথেন্স স্পার্টার কাছে পরাজিত হয়। যুদ্ধে পরাজয়ের পর এথেন্সের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

● গ্রীস দেশের দুটি ছোট রাজ্যের ঝগড়া কেন্দ্র করে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে পেলোপন্নিসিয়ান যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে এথেন্স হেরে যায়।

৬ষ্ঠ পাঠ : এথেন্সের সাংস্কৃতিক গৌরব

এথেন্সের সভ্যতা ও সংস্কৃতিই গ্রীক-সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ের পর এথেন্স গ্রীক-সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এথেন্সের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সময় পেরিক্লিসের যুগ। এই সময়ে দেশে কয়েক দশকের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এথেন্সের নাগরিকদের অধিকার ছিল সমান। তা ছাড়া নতুন সাম্রাজ্য জয়ের ফলে এথেন্সের

সমৃদ্ধিও অনেক বেড়ে যায়। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য এই সময়ে এথেন্সের সংস্কৃতিরও খুব উন্নতি হয়।

সাহিত্য—গ্রীক নাটকই এই যুগের গ্রীক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসে এসকাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিদিস ও এরিস্তোফিনিস নামে চারজন বিখ্যাত নাট্যকার জন্মগ্রহণ করেন। মানুষের আদর্শ ও জীবনের নানাদিক নিয়ে তাঁরা বহু নাটক রচনা করেন। গ্রীক নাটকে নাচ, গান, অভিনয়, সংলাপ, কবিতা, গভীর ভাব ও চিন্তা একসঙ্গে দেখা যায়। বিশেষ করে তাঁদের বিয়োগান্ত নাটকগুলো এক অপূর্ব সৃষ্টি। এইসব নাটকে পরিচিত কাহিনীই প্রত্যেক নাট্যকার নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। মানুষের জীবনে এক অদৃশ্য নিয়তির প্রভাব, নানা জটিলতা ও দুঃখবেদনা এই নাটকগুলোর বিষয়।

শিল্পকলা—গ্রীক স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার শুরু খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। গ্রীক সঙ্গীত অত্যন্ত উন্নত ছিল, কিন্তু আমরা তার অতি সামান্যই বর্তমানে শুনতে পাই। মাটির পাত্রে আঁকা কিছু ছবি ছাড়া গ্রীক চিত্রের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি। তবে গ্রীক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সত্যই দেখবার মত। কিন্তু সব-কিছুই ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এদের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। এথেন্সের এক্রোপোলিসে (দুর্গ) যে-স্থাপত্যের নমুনা আছে তার সৌন্দর্য অপূর্ব। পার্থেননের বিজয়-স্তম্ভ আজও এথেন্সের সাম্রাজ্য-গৌরবের পরিচয় দেয়। স্থাপত্য-শিল্পের নমুনা হিসেবে এথেন্সের দিওনুসস রঙ্গমঞ্চ এবং সিসিলি দ্বীপের সিরাকুস নগরের ও গ্রীসের এপিদোরসের রঙ্গমঞ্চ দুটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

গ্রীক-শিল্পের গৌরবের যুগে ব্রোঞ্জের যেসব বিরাট বিরাট মূর্তি তৈরি হয়েছিল সেগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবে রোমান আমলে এই সব মূর্তির অনুকরণে যেসব মূর্তি তৈরি হয়েছিল তা দেখে আসল মূর্তির সৌন্দর্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। দেহের লাবণ্যের সঙ্গে শক্তির অপূর্ব মিশ্রণ একমাত্র গ্রীক-ভাস্কর্যেই দেখা যায়।

ধর্ম—প্রাচীনকালের অন্যান্য দেশের মত গ্রীসদেশের লোকেরা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত। গ্রীসের দেব-দেবীরা মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। মানুষের ভাগ্যও তাদের ইচ্ছামত চলত। এই সব দেবতারা স্বর্গে বাস করতেন। বজ্রের দেবতা জিউস দেবতাদের রাজা ছিলেন। গ্রীকদেবতারা শুধু ক্ষমতায় ও অমরতায় মানুষের চেয়ে বড় ছিলেন। অন্য বিষয়ে মানুষের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য ছিল না। গ্রীক-দেবতাদের মধ্যে জিউস, পোসেইদোন, আপেল্লো, আরেস্, হেরা, আর্তেমিস, আথেন, দেমেতের





গ্রীক দেব-দেবী

প্রভৃতির নাম করা যায়। তবে পরে দিওনুসস সবচেয়ে প্রভাবশালী দেবতা হন। এইসব দেবতা ছাড়াও গ্রীসদেশে গাছ, পাথরের টুকরো ও জীবজন্তুর পূজা প্রচলিত ছিল। দৈববাণীর (দেবতাদের কথা) উপর গ্রীসের লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। আপেল্লো ছিলেন দৈববাণীর প্রধান দেবতা।

● ১। এথেন্সের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সময় পেরিক্লিসের যুগ।

২। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের সাহিত্য ও শিল্পকলার খুব উন্নতি হয়।

৩। অন্যান্য দেশের মত গ্রীকরাও নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত। তাছাড়া তারা গাছ, পাথর ও জীবজন্তুর পূজাও করত।

৭ম পাঠ ঃ কয়েকজন প্রধান মনীষীর পরিচয়

পেরিক্লিস—পেরিক্লিসের শাসনের সময়ই এথেন্সের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবের যুগ। পেরিক্লিস ৪৯০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি এথেন্সের সাধারণ লোকের সুযোগ-সুবিধার জন্য চেষ্টা করেন এবং দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর চেষ্টায় গ্রীস-পারস্য যুদ্ধের পর এথেন্সের সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। তিনি উদারভাবে এই সাম্রাজ্য শাসন করেন এবং সাম্রাজ্যের প্রতিটি রাজ্য যাতে উন্নতি করার সুযোগ পেতে পারে তিনি তারও ব্যবস্থা করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্য ভালবাসতেন। তাঁর সময়েই পার্থেনন নতুন করে তৈরি হয় এবং এক্রোপোলিসে সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য গড়ে ওঠে। এই যুগেই গ্রীসের শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়। এই যুগকে পেরিক্লিসের যুগ বলা হয়। এই সময়ে সফোক্লিস, ইউরিপিদিস ও ফিদিয়াস জন্মগ্রহণ করেন।


পেরিক্লিস

সফোক্লিস—পারস্যের গ্রীস আক্রমণ, গ্রীকদের স্বাধীনতার জন্য এথেন্সের যুদ্ধ এবং এথেন্সে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগের নাট্যকার ছিলেন সফোক্লিস। বহু বিষয় নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেন। সফোক্লিসের নাটকে ধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। তাঁর নাটকে অদৃষ্ট বা নিয়তির প্রভাব অন্যান্য গ্রীক নাট্যকারদের তুলনায় অনেক কম। সফোক্লিসের 'ইদিপাস টিরানাস' সম্ভবত গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে আধুনিক লোকের কাছে তাঁর 'আন্তিগোনে' নাটকটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।

সক্রেটিস সাহিত্য ও শিল্পের মত এই সময় এথেন্সে দর্শনশাস্ত্রেও নতুন নতুন চিন্তা দেখা দেয়। গ্রীক দার্শনিক হিসেবে থালেস, আনাক্সিমান্দর, আনাক্সিমেনাস, প্লাতো, আরিস্তোতলের নাম খুব পরিচিত হলেও, গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিসের নামই সবার আগে বলতে হয়। ৪৬৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সক্রেটিস এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৯৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁর অবাধ মেলামেশা ছিল। প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর দর্শন প্রচার করার একটি নতুন উপায় বের করেন। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধেই তিনি তাঁর স্বাধীন এবং মৌলিক মতামত প্রকাশ করেন। প্রকৃত সত্য জানাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তাঁর স্বাধীন মতের জন্য তিনি দেশের শাসকদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাদের ধারণা হয় যে, সক্রেটিস দেশের লোককে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য শাসকরা সক্রেটিসকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার নির্দেশ দেয়।


সক্রেটিস

সক্রেটিস কিছু লিখে যাননি। তাই তাঁর চিন্তা ও ভাবের পরিচয় দেওয়া কঠিন। তবে সক্রেটিসের শিষ্য প্লাতোর রচনায় তাঁর চিন্তাধারার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

হেরোডোটাস—ইতিহাস-বিষয়ের রচনাও এই সময়ের গ্রীক সংস্কৃতির অন্যতম গৌরব। 'ইতিহাসশাস্ত্রের পিতা' নামে পরিচিত

হেরোডোটাস খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আইয়োনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা 'হিস্টরিস'-এ গ্রীকদের উপনিবেশের কথা, পারস্যের সঙ্গে গ্রীকদের যুদ্ধের কাহিনী এবং গ্রীসদেশের সীমান্ত থেকে পারস্যের সৈন্যবাহিনীর ফিরে আসার বিবরণ ভালভাবে জানা যায়। প্রথম ইতিহাস-রচয়িতা হিসাবে হেরোডোটাসের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।


হেরোডোটাস

● এথেন্সের গৌরবের যুগে পেরিক্লিস, সফোক্লিস, সক্রেটিস, হেরোডোটাস প্রভৃতি মনীষী জন্মগ্রহণ করেন।

৮ম পাঠ : ম্যাসিডন—আলেকজাণ্ডার—তাঁর ভারত আক্রমণ

গ্রীসের উত্তর-পশ্চিম দিকে ম্যাসিডন রাজ্য। গ্রীসের রাজনীতিতে ম্যাসিডনের কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু ৩৫৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ফিলিপের সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাসিডনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পুরোপুরি বদলে যায়। তিনি শিক্ষিত, স্থায়ী ও পেশাদারী একটি বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই সেনাবাহিনীর সাহায্যে ফিলিপ দানিয়ুব নদীর তীর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করেন। পরে চেরোনিয়ার যুদ্ধে এথেন্স ও থিবিসের সেনাবাহিনী পরাজিত হলে প্রায় সমগ্র গ্রীস ম্যাসিডনের অধিকারে আসে। কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার আগেই ফিলিপ শত্রুর হাতে মারা যান।

ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের সিংহাসনে বসেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৩৬ অব্দ থেকে ৩২৩ অব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। সিংহাসনে বসার পরেই তিনি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্য তৈরি হন। তিনি পারস্য-সাম্রাজ্য আক্রমণের কথা ভাবেন।

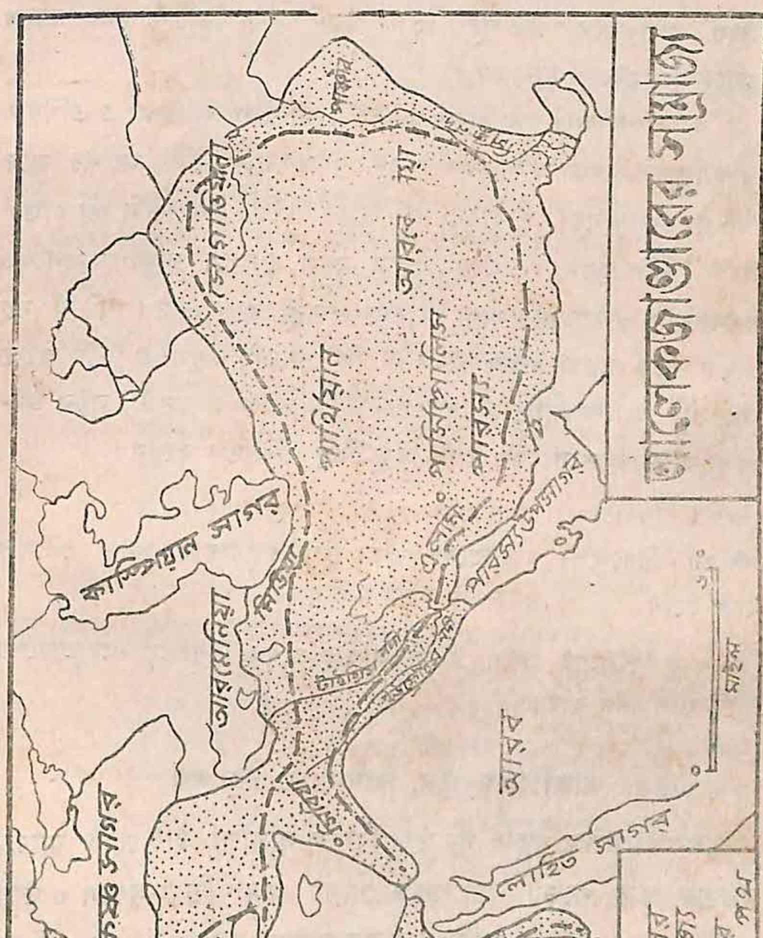
আলেকজাণ্ডার প্রথমে দক্ষিণ-গ্রীস অধিকার করে পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। ইসাসের যুদ্ধে পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুসের বাহিনী পরাজিত হয়। গৌগামেলার যুদ্ধের ফলে পারস্য সাম্রাজ্য তাঁর অধিকারে আসে। কিছুদিনের মধ্যে আলেকজাণ্ডার গ্রীকদের বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ফিনিশীয় বণিকদের রাজ্য জয় করেন। মিশরও তাঁর অধিকারে আসে।


আলেকজাণ্ডার

৩২৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতের সীমানায় এসে পৌঁছান। তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তখন এই অঞ্চলে ছোট ছোট অনেক রাজ্য ছিল। এইসব রাজ্যের মধ্যে পুরু, তক্ষশীলা, অভিসার, ক্ষুদ্রক, অস্মক, গান্ধার, সৌভূতির নাম উল্লেখযোগ্য। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিতে ব্যস্ত থাকায় এইসব রাজ্য আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে একযোগে বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টা করেনি। ফলে আলেকজাণ্ডার সহজেই এই সব রাজ্য জয় করেন। তক্ষশীলার রাজা বিনা যুদ্ধেই আলেকজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু ঝিলাম ও চেনাব নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলের পুরুরাজ অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেন। ভারতে অভিযানের সময় আলেকজাণ্ডার রাজা পুরুর কাছেই প্রথম প্রবল বাধা পান।

পুরুরাজ খুব সাহসী বীর ছিলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের হঠাৎ আক্রমণে তাঁর সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর পুরুরাজ বন্দী হন। আলেকজাণ্ডার পুরুরাজের বীরত্ব ও আত্মসম্মান দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। তা ছাড়া গ্রীক সম্রাট পুরুর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর জয়-করা কয়েকটি রাজ্যও পুরুকে দান করেন।

পুরুর সঙ্গে যুদ্ধের পর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অধিকার করেন। গঙ্গার তীরের রাজ্যগুলোও জয় করার ইচ্ছা তাঁর ছিল।



কিন্তু মগধের নন্দ-সাম্রাজ্যের বিশাল সেনাবাহিনীর কথা শুনে তাঁর

ক্লান্ত সৈন্যরা আর এগিয়ে যেতে রাজি হয়নি। বাধ্য হয়ে আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের দিকে যাত্রা করেন। স্বদেশে ফিরে যাবার সময় ব্যাবিলনে খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩২৩ অব্দে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডার অল্পদিনের মধ্যেই ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার এক বিরাট অঞ্চল অধিকার করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি বহু রাস্তা-ঘাট তৈরি করান। তাঁর চেষ্টার ফলে স্থলপথ ছাড়া জলপথেও ইয়োরোপ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক বেড়ে ওঠে। তিনি বহু নতুন নতুন নগরের পত্তন করেন। নিজের নাম অনুসারে তিনি অন্তত সতেরটি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। নতুন জয়-করা রাজ্যের শাসনেরও তিনি কিছু কিছু পরিবর্তন করেন।

● ১। গ্রীসদেশের ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

২। ফিলিপের ছেলে আলেকজাণ্ডার পারস্য, মিশর জয় করে ভারতের কিছু অংশ দখল করেন।

৯ম পাঠ : সাম্রাজ্যের পতন, রোমানদের গ্রীস জয়

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস ও তাঁর বংশধরেরা সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে রাজত্ব করতে থাকেন। আর মিশর ও তার পাশের অঞ্চলে রাজত্ব করতে থাকেন তাঁর অন্যতম সেনাপতি টলেমির বংশের লোকেরা। পরে রোম-সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১ম শতাব্দীতে সমস্ত গ্রীসদেশ রোমের অধিকারে চলে যায়। গ্রীসের গৌরবের দিনও শেষ হয়ে যায়।

● আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। শেষে রোম গ্রীস অধিকার করে।

অনুশীলনী

১। কিভাবে ক্রীটের সভ্যতা গ্রীসের উপর প্রভাব ফেলে ?

২। হোমারের মহাকাব্য দুটি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। কিভাবে গ্রীসে নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ?

৪। এথেন্স ও স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। পেলোপন্নিসিয়ান যুদ্ধ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৬। এথেন্সের সাহিত্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। এথেন্সের শিল্পকলার কথা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৮। গ্রীসদেশের ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৯। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও—(ক) পেরিক্লিস; (খ) সফোক্লিস; (গ) সক্রেটিস; (ঘ) হেরোডোটাস।

১০। ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ সম্বন্ধে কি জান ?

১১। আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য জয়ের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১২। আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৩। আলেকজাণ্ডারের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

১৪। কিভাবে আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের পতন হয় ?

১৫। কেন এবং কোথায় গ্রীকরা উপনিবেশ গড়ে তোলে ? উপনিবেশগুলোর সঙ্গে গ্রীসদেশের কি সম্পর্ক ?

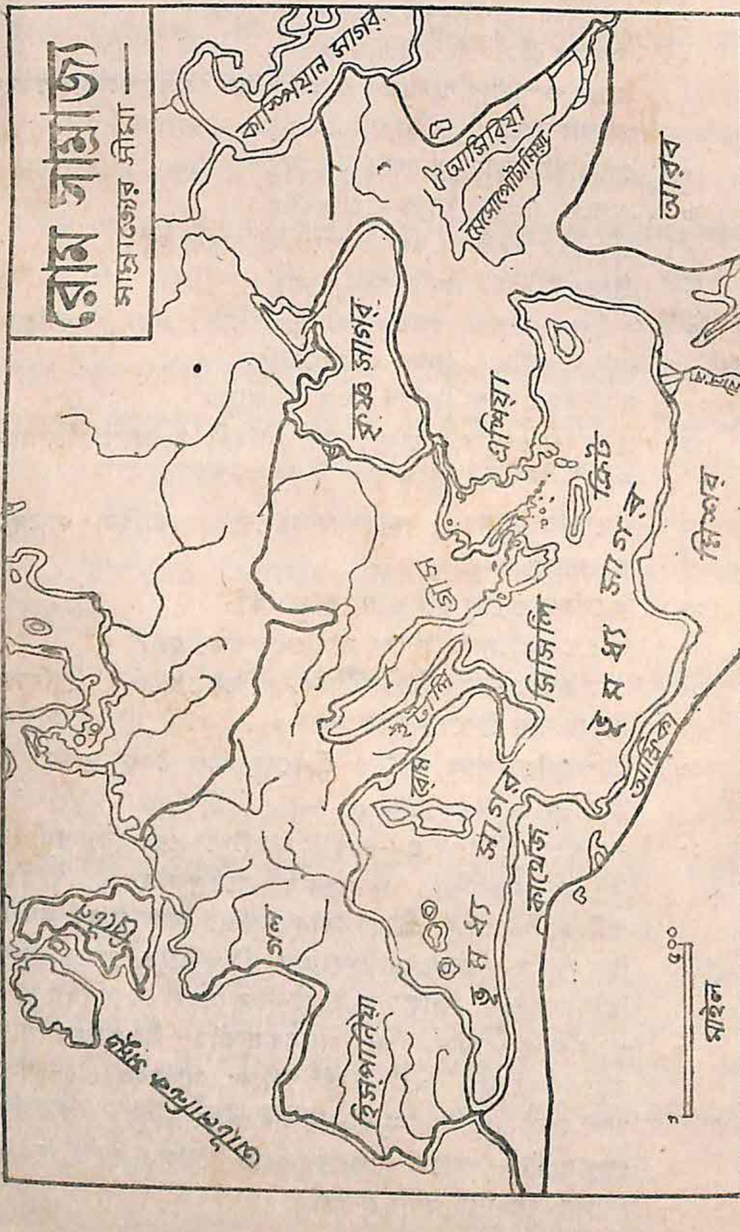
১৬। বিভিন্নস্থানে বাস করলেও গ্রীকদের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল ছিল ?

১৭। সংক্ষেপে উত্তর দাও :—(ক) সক্রেটিসকে কেন হত্যা করা হয় ? (খ) আলেকজাণ্ডার কেন পুরুর ব্যবহারে খুশি হন ? (গ) দৈববাণী কাকে বলে ? গ্রীসের কোন্ দেবতার দৈববাণী খুব জনপ্রিয় ছিল ? (ঘ) এথেন্সের সামাজিক রীতি-নীতি কেমন ছিল ? (ঙ) স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল ?

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—(ক) আলেকজাণ্ডার—খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। (খ) —খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার—শহরে মারা যান। (গ) — যুগই এথেন্সের গৌরবের যুগ। (ঘ) পারস্যের সম্রাট — আলেকজাণ্ডারের কাছে পরাজিত হন। (ঙ) — ছিলেন দৈববাণীর প্রধান দেবতা।

অষ্টম অধ্যায়

রোম


রোম সাম্রাজ্য
সাম্রাজ্যের সীমা
কাস্পিয়ান সাগর
আসিরিয়া
মেসোপোটামিয়া
আরব
কৃষ্ণ সাগর
এশিয়া
ক্রিট
মিশর
গ্রীস
সিসিলি
ভূ ম ধ্য সা গ র
ইটালি
রোম
কার্থেজ
আফ্রিকা
গল
হিস্পানিয়া
আটলান্টিক মহাসাগর
মাইল

১ম পাঠ : রোম নগরের পত্তন ; রোম-কার্থেজ যুদ্ধ

রোম নগরের পত্তন—পৌরাণিক কাহিনীতে আছে রোমুলাস ও রেমুস নামে দুই ভাই টাইবার নদীর পাড়ে ৭৫৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে রোম নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাহিনী সত্য নয় বলেই মনে হয়। কারণ ৭৫৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের আগেকার অনেক কবর এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থানের জন্য সম্ভবত প্রাচীনকাল থেকেই ইতালিতে নানাজাতি বসবাস করতে থাকে। পরে গ্রীস, পারস্য, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যদেশের সঙ্গে রোমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমুদ্রের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা এবং অন্যান্য সভ্যদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে রোম ইতালির অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে তাড়াতাড়ি উন্নত হয়। সম্ভবত খ্রীষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে টাইবার নদীর তীরের সাতটি পাহাড়ের (বা রোমের) লোকেরা মিলে ইতালির বিভিন্ন জায়গা দখল করে। প্রাচীনকালের অন্যান্য দেশের মত কোন রাজা বা সম্রাট রোমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি। রোমের সাধারণ লোকেরা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই প্রজাতন্ত্রই ধীরে ধীরে ইতালির রোম সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। রোম তার ক্ষমতা বাড়িয়ে শুধু ভূমধ্যসাগরের অঞ্চল নয়, প্রায় সমস্ত প্রাচীন সভ্যদেশই নিজের অধিকারে আনে। তবে কেবল রাজ্য জয় করেই রোমের মানুষেরা সন্তুষ্ট হয়নি, সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে খুব উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের সভ্যতারও প্রচলন করে।

রোম-কার্থেজ যুদ্ধ—আফ্রিকার উত্তর-উপকূলে ফিনিশীয় বণিকদের কার্থেজ নামে একটি বড় বাণিজ্য-বন্দর ছিল। কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে কার্থেজের লোকেরা উন্নত ছিল। কার্থেজের শাসন চালাত দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীরা। আফ্রিকা, স্পেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলও কার্থেজের অধিকারে ছিল। ফলে ভূমধ্যসাগরের সমস্ত অঞ্চলই কার্থেজের অধিকারভুক্ত হয়। এদিকে শক্তি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোম কার্থেজের বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। সেজন্য কার্থেজ রোমকে ধ্বংস করার চেষ্টা শুরু করে। তবে সিসিলির

রাজনৈতিক বিবাদকে কেন্দ্র করেই কার্থেজ ও রোমের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সিসিলির ম্যাসিনার লোকেরা কার্থেজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে রোমের সাহায্য চায়। রোম কার্থেজের ক্ষমতা কমাবার জন্য ম্যাসিনাকে সাহায্য করতে রাজি হয়। ফলে খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৬৪ অব্দে কার্থেজ ও রোমের মধ্যে প্রথম পিউনিক যুদ্ধ শুরু হয়। নৌবাহিনীর অভাবের জন্য রোম যুদ্ধের প্রথম দিকে বেশ অসুবিধায় পড়ে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রোম এক বিশাল নৌবাহিনী তৈরি করে। দীর্ঘ যুদ্ধের পর ২৪১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে রোমের কাছে পরাজিত হলে কার্থেজ শান্তি-চুক্তি করে। এই চুক্তির ফলে সায়রাকিউজ ছাড়া সিসিলির অন্য সমস্ত অঞ্চল রোমের অধিকারে আসে।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরেও কার্থেজ রোমের শক্তিকে মেনে নিতে রাজি হয়নি। কার্থেজ স্পেন পুরোপুরি দখল করে নিয়ে স্থলপথে রোম আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কার্থেজের সেনাপতি হ্যানিবল ২১৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আল্পস পর্বত পেরিয়ে ইতালিতে ঢুকে পড়েন। পরের পনের বৎসর হ্যানিবল রোমানদের বারবার যুদ্ধে পরাজিত করেন। এর পর রোমের সৈন্যরা কার্থেজ বন্দর আক্রমণ করলে হ্যানিবল দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। সেখানে ২০২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে রোমের কাছে যামার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে কার্থেজ স্পেনের সাম্রাজ্য রোমকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। রোমের অনুমতি ছাড়া কোন যুদ্ধ না করতেও কার্থেজ রাজি হয়।

কিন্তু ১৪৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রোম আবার কার্থেজ আক্রমণ করে। এই যুদ্ধের নাম তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ। যুদ্ধে জয়ের পর রোম কার্থেজ শহরকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে এবং এখানকার সমস্ত লোককে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়।

● ১। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে রোমুলাস ও রেমুস নামে দুই ভাই ৭৫৩ খ্রীঃ পূঃ রোম নগরের পত্তন করেন।

২। প্রাচীন রোমে কোন রাজা ছিল না। রোমের সাধারণ লোকেরা

সেখানে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই প্রজাতন্ত্রই রোমের সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

৩। শক্তিশালী হয়ে ওঠায় রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধ বাধে।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজ রোমের কাছে হেরে যায়। তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধে জয়ী হয়ে রোম কার্থেজ ধ্বংস করে ফেলে।

২য় পাঠ : প্রাচীন রোমের সমাজ

প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ান (অভিজাত ও সাধারণ মানুষ)— রোমের সমস্ত মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করত। পরিবারের সব ক্ষমতা থাকত পিতার হাতে। তিনি পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি 'জেনস' গঠিত হত। জেনসের নামেই পরিবারগুলো পরিচিত হত। সমাজে নারীদের খুব সম্মান ছিল। তাদের লেখাপড়ারও সুযোগ ছিল। সামাজিক উৎসবে নারীরা স্বামীদের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন। সংসার চালানো ও সন্তানদের মানুষ করার দায়িত্ব তাদের উপর ছিল।

রোমের জনসাধারণের মোটামুটিভাবে দুটি শ্রেণী ছিল। এই দুটি শ্রেণীর একটি অভিজাত বা প্যাট্রিশিয়ান, আর একটি সাধারণ লোক বা প্লেবিয়ান। প্যাট্রিশিয়ানরা ছিল ধনী। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা তারাই বেশি ভোগ করত। প্লেবিয়ানরা ছিল দরিদ্র। দেশের রাজস্ব ও যুদ্ধের জন্য ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ তাদেরই দিতে হত। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ তারা পেত না।

প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ান এই দু শ্রেণীরই রোমের নাগরিক অধিকার থাকলেও সাধারণভাবে দেশ চালাত কিন্তু প্যাট্রিশিয়ানরা। শাসন-পরিষদের নাম ছিল সেনেট। রোমে রাজাদের আমলে প্যাট্রিশিয়ানরাই সেনেটের সভ্য হত। রাজাদের তাড়িয়ে রোমে

প্রজাতন্ত্র স্থাপনের পরেও এই নিয়মই বহাল ছিল। রাজার বদলে জনসাধারণের নির্বাচিত দুজন কনসালের হাতে দেশের সমস্ত শাসনের দায়িত্ব ছিল। এই দুজন কনসাল আগের মত প্যাট্রিশিয়ানদেরই সেনেটের সভ্য মনোনীত করতেন। প্লেবিয়ানরা শুধু কনসাল এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারী নির্বাচনে ভোট দিতে পারত। তাদের ভোট পাওয়ার জন্য প্যাট্রিশিয়ান প্রার্থীরা প্লেবিয়ানদের নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দিত। তবে সে-যুগের শাসনে প্লেবিয়ানদের সত্যিকারের কোন হাত ছিল না। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও তারা পেত না। এমন কি প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্কও ছিল না। এভাবে বিরাট পার্থক্য থাকার জন্য দু শ্রেণীর মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। প্রায় আড়াই শ বছর ধরে এই বিবাদ চলে। পরে প্লেবিয়ানরা তাদের দাবি আদায় করে নেয়। ৫০৯ থেকে ২৬৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে রোমে অনেকগুলো নতুন আইন চালু হয়। এইসব আইনের ফলে প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ানদের পার্থক্য কমে যায়।

● ১। প্রাচীন রোমের সমাজে পিতা ছিল পরিবারের কর্তা।

২। প্রাচীন রোমে প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ান নামে দু শ্রেণীর নাগরিক ছিল। দেশের ক্ষমতা ছিল প্যাট্রিশিয়ানদের হাতে, আর রাজস্ব ও যুদ্ধের খরচ যোগাত গরীব প্লেবিয়ানরা।

৩য় পাঠ : রোমের নাগরিক অধিকার

প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ান এই দু শ্রেণীর লোকেরাই রোমের নাগরিক অধিকার ভোগ করত। একমাত্র স্ত্রীলোক, ক্রীতদাস ও বিদেশী লোকেরা রোমের নাগরিক অধিকার পেত না। রোমের নাগরিক অধিকার গর্বের বস্তু ছিল। রোমের নাগরিকের কতকগুলো বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিও তাদের কতকগুলো কর্তব্য ছিল। যুদ্ধে যোগ দিতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যের যে-কোন স্থানে বাস করতে ও যে-কোন

দায়িত্ব পালন করতে প্রত্যেক নাগরিক বাধ্য ছিল। প্রথম দিকে নাগরিক অধিকার একমাত্র রোমের লোকেরাই পেত। কিন্তু পরে সাম্রাজ্যের আয়তন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্থানের লোকদেরও রোমের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়।

● একমাত্র রোমের লোকেরাই রোমের নাগরিক অধিকার পেত। পরে সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের লোকেরাও নাগরিক অধিকার পায়।

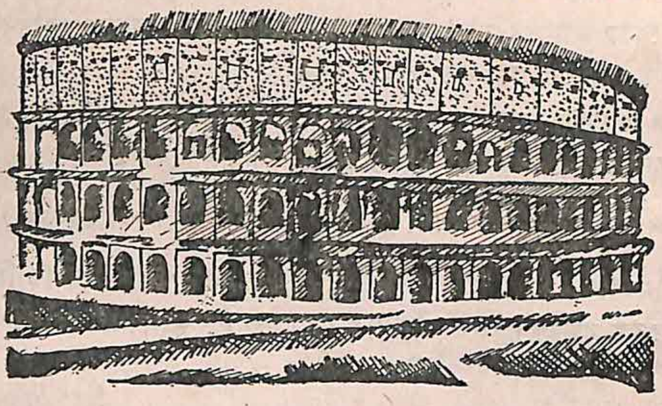
৪র্থ পাঠ : ক্রীতদাস-প্রথা ও ক্রীতদাস-বিদ্রোহ (স্পার্টাকাস)

প্রাচীনকালে প্রায় প্রত্যেক দেশেই ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণত যুদ্ধবন্দীদেরই ক্রীতদাস করা হত। অনেক সময় অন্য দেশ থেকেও ক্রীতদাস কেনা হত। ক্রীতদাসরা সারাদিন পশুর মত খাটত। শ্রমের বদলে তারা খাওয়া-পরা ছাড়া অন্য কিছু পেত না। রোমের যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ক্রীতদাসের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। তখনকার দিনে লোকেরা টাকা-পয়সা দিয়ে ক্রীতদাস কিনত। ক্রীতদাসের সংখ্যা যার বেশি, সমাজে তার সম্মানও হত বেশি। নতুন কোন রাজ্যজয়ের পর রোমের ধনীরা সেখানকার জমি অধিকার করত। আবার জমি চাষবাস ও অন্যান্য কাজ করার জন্য বাজার থেকে সস্তায় ক্রীতদাস কিনে আনত। তারা ক্রীতদাসের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করত। পরে ক্রীতদাস এবং যুদ্ধবন্দীদের কুস্তি লড়তে হত, এমনকি তাদের পশুর সঙ্গেও লড়তে হত। এই সব লড়াই রোমানদের কাছে একটা উপভোগের বিষয় ছিল। এই কুস্তির লড়াই বা পশুর সঙ্গে লড়াই সাধারণত বিরাট প্রাসাদ বা কলোসিয়ামের প্রাঙ্গণে হত। অ্যাম্পিথিয়েটারেও (রঙ্গমঞ্চ) অভিনয় ছাড়াও মাঝে মাঝে এ ধরনের লড়াই হত। গ্যালারিতে বসে সমাজের উঁচু শ্রেণীর নারী ও পুরুষেরা এসব লড়াই দেখত।


রোমের ক্রীতদাস

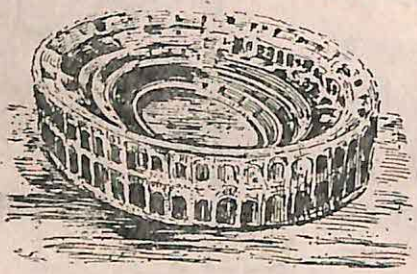
ক্রীতদাসের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোমে কতকগুলো

নতুন সমস্যা দেখা দেয়। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৭৩ অব্দে, কুস্তি-লড়িয়ে ক্রীতদাসরা হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ইতালির প্রায় সব জায়গায়



কলোসিয়াম

এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। থেসালির স্পার্টাকাস এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। তিনি ৭০ জন সঙ্গী নিয়ে ক্যাপুয়া থেকে পালিয়ে আসেন। সিসিলির ক্রীতদাসরাও এই সময় বিদ্রোহ করে। কিন্তু স্পার্টাকাসের দলের লোকদের রোমানদের হাত থেকে পালিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাই সব বিদ্রোহী মিলে রোমানদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তবু প্রায় দু-বছর ধরে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির কাছের অঞ্চল থেকে ক্রীতদাসরা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যায়। শেষে রোমানরা বিদ্রোহীদের হারিয়ে দিয়ে স্পার্টাকাস ও প্রায় দু-হাজার ক্রীতদাসকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।



অ্যাম্পিথিয়েটার

●১। রোমে সাধারণত যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস করা হত। বাইরে থেকেও ক্রীতদাস কেনা হত।

২। ক্রীতদাসদের উপর খুব অত্যাচার করা হত। তাদের দিয়ে কুস্তির লড়াই ও পশুর সঙ্গে লড়াই করানো হত।

৩। ক্রীতদাস স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ক্রীতদাসরা বিদ্রোহ করে। শেষে রোমানরা স্পার্টাকাস ও আরও অনেককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

৫ম পাঠঃ জুলিয়াস সীজার ; প্রজাতন্ত্রের অবসান

সাম্রাজ্য-বিস্তারের ফলে রোমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। সেনাপতিদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। তখনকার রোমে ছিল অঢেল টাকাকড়ি, অনেক ক্রীতদাস, নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ, সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশা আর শক্তিশালী সেনাবাহিনী। এই অবস্থায় প্রজাতন্ত্রের নানা দুর্বলতার সুযোগে দেশের সাধারণ লোকের সমর্থনে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতিরা রোমে ক্ষমতা দখল করে নেয়। রোমে প্রজাতন্ত্রের অবসান হয়। ম্যারিয়াস, সুলা, পম্পে, জুলিয়াস সীজার প্রভৃতি সেনাপতিরা এই ক্ষমতা দখলের নেতৃত্ব দেন। ম্যারিয়াস ও সুলার মৃত্যুর পর পম্পে জুলিয়াস সীজার ও ক্রেসাসকে নিয়ে রোমের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করেন। জুলিয়াস সীজার ফ্রান্স, জার্মানীর কিছু অংশ এবং ইংলণ্ড জয় করে অল্পদিনের মধ্যেই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সীজারের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ায় পম্পে খুব ভয় পান। সীজার ইতালিতে ফিরে এলে পম্পে গ্রীস দেশে পালিয়ে যান। তারপর ফার্সালাসে সীজারের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হেরে পম্পে মিশরে চলে যান। সীজার মিশর আক্রমণ করেন। মিশর জয় করে তিনি মিশরের রাজকুমারী ক্লিওপেট্রাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেশে ফিরে আসেন। রোমের সেনেট সঙ্গে সঙ্গে সীজারকে দশ বছরের জন্য দেশের একনায়ক হিসেবে মনোনীত করে।



জুলিয়াস সীজার

দায়িত্ব নিয়েই সীজার রোমের শাসনের কিছু কিছু পরিবর্তন করেন। সব নাগরিকই সেনেটের সদস্য হতে পারে। নতুন জয়-করা সাম্রাজ্যের লোকেরা রোমের নাগরিক-অধিকার পায়। সাম্রাজ্যের দূরের অঞ্চলের শাসনেও তিনি কিছু অদল-বদল করেন। জুলিয়াস সীজারের এই সব সংস্কারের ফলে রোমের জনসাধারণ খুব খুশি হয়। কিন্তু প্যাট্রিশিয়ানদের ধারণা হয় যে সীজার রোমের প্রজাতন্ত্র ধ্বংস

করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। সেজন্য তাদের কিছু লোক সীজারের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করে। ৪৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ১৫ই মার্চ ষড়যন্ত্রকারীরা সেনেটের ভিতরেই জুলিয়াস সীজারকে হত্যা করে।

● ১। সেনাপতিরা রোমের প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করে ক্ষমতা দখল করে। পম্পেকে হারিয়ে অন্যতম সেনাপতি জুলিয়াস সীজার রোমের একনায়ক হন।

২। জুলিয়াস সীজার রোমের শাসনব্যবস্থায় অনেক সংস্কার করেন। প্যাট্রিশিয়ানরা ষড়যন্ত্র করে সীজারকে হত্যা করে।

৬ষ্ঠ পাঠঃ রোমের নতুন সাম্রাজ্য ; সাম্রাজ্যের পতন

রোম-সাম্রাজ্য—জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর তাঁর দুজন অনুগত সেনাপতি অ্যান্টনি ও অক্টাভিয়াসের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধে অ্যান্টনির মৃত্যুর পর অক্টাভিয়াস রোম-সাম্রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেন। রোমের সেনেট তাঁকে একনায়ক হিসেবে মনোনীত করতে চায়। কিন্তু তিনি একনায়ক হতে অস্বীকার করেন। কিছুদিন পরে সেনেট-সভ্যরা ও সেনাবাহিনী অক্টাভিয়াসকে অগাস্টাস বা সম্রাট বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। এভাবে রোমের প্রজাতন্ত্র শক্তিশালী এক সম্রাটের অধীনে চলে যায়। কিন্তু রোমের সাধারণ নাগরিকরা সে-কথা তখনও বুঝতে পারেনি এবং তাঁকে কোন বাধাও দেয়নি। ১৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে সম্রাট অক্টাভিয়াস সাধারণ প্রজাদের কাছে প্রায় দেবতাদের মত পূজা পেতে থাকেন।

রোমের এই নতুন সাম্রাজ্য কয়েক শ বৎসর স্থায়ী হয়। টাইবেরিস, ক্লডিয়াস, নীরো, হ্যাড্রিয়ান প্রভৃতি সম্রাটরা রোম সাম্রাজ্যের শক্তি আরও বাড়ান। স্কটল্যাণ্ড থেকে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত এবং আটলান্টিক সমুদ্র থেকে টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকা পর্যন্ত রোম-সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়।

রোম সাম্রাজ্যের পতন—৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম-সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট রোমুলাস অগাস্টালাসকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোম-সাম্রাজ্যের পতন হয়। কিন্তু রোম-সাম্রাজ্য যেমন একদিনে গড়ে ওঠেনি, একদিনে তার পতনও হয়নি। ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা করার লোভ, খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যাওয়া, শ্রমিকদের অল্প বেতন, সাধারণ লোকদের প্রতি শাসকদের অবহেলা ও অত্যাচার

প্রভৃতি ধীরে ধীরে রোম-সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তুলছিল। অন্যদিকে রোমের মত একটি নগর রাষ্ট্রের পক্ষে এত বড় সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন শাসন করা অসম্ভব ছিল। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের গুরুত্ব একেবারেই কমে যায়। এই সময় খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারের ফলে রোমের সাধারণ লোকের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে।

প্রথম যুগের রোমের সম্রাটরা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু পরের যুগের সম্রাটরা ভাল যোদ্ধা হলেও জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁদের ক্ষমতা নির্ভর করত দেহরক্ষী ও সৈন্যবাহিনীর উপর। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা রইল কি গেল তাতে সাধারণ লোকের কিছু আসত যেত না। ফলে রোমের শক্তিও ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে।

এছাড়া উত্তর-ইউরোপের বিভিন্ন উপজাতিরা বারবার আক্রমণ করে রোমের শক্তি কমিয়ে আনে। এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সম্রাট কনস্ট্যানটাইন এশিয়া ও ইউরোপের সীমানায় বাইজান্টিয়ামে রাজধানী সরিয়ে নেন। নতুন রাজধানীর নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। কনস্টানটাইনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে নিজেদের মধ্যে রোম-সাম্রাজ্য দু ভাগে ভাগ করে নেয়। পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় কনস্টান্টিনোপল, আর পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম। এভাবে ভাগ হয়ে যাওয়ায় সাম্রাজ্যের দুর্বলতা আরও বেড়ে যায়। পরে হূণদের আক্রমণে রোম-সাম্রাজ্য একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

১। সম্রাটদের আমলে রোম-সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল স্কটল্যাণ্ড থেকে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত এবং আটলান্টিক সমুদ্র থেকে মেসোপোটামিয়া পর্যন্ত।

২। রোম-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ—(ক) সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন, (খ) শাসনের ত্রুটি, (গ) খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসার, (ঘ) সাম্রাজ্যের বিভাগ ও (ঙ) বিদেশী আক্রমণ।

৭ম পাঠ ঃ খ্রীষ্টধর্মের প্রচার

যীশুখ্রীষ্ট প্রায় দু হাজার বছর আগে জেরুসালেমের কাছে বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম মেরী।

যীশু জাতিতে ইহুদি ছিলেন। তিনি ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করতেন। পরে যীশু ভগবানের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁর ধর্মের

মূল কথা হল—ভগবানই সকল মানুষের পিতা। শিশুর মত সরলতা ও পবিত্র মনোভাব নিয়ে ভগবানের উপর সকলের নির্ভর করা উচিত। কিন্তু তখন ইহুদি পুরোহিতরা যীশুর এই মত মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাঁকে তারা বিদেশি শাসকদের হাতে তুলে দেয়। যীশুকে পরে ক্রুশে বিদ্ধ করে মারা হয়। যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর প্রচলিত মত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যীশুর প্রচারিত নতুন ধর্মের নাম খ্রীষ্টধর্ম। এই ধর্মের লোকদের খ্রীষ্টান বলা হয়। খ্রীষ্টানধর্মের পবিত্র গ্রন্থের নাম বাইবেল।

রোমে যাঁরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন তাদের মধ্যে সেন্ট পল ও সেন্ট পিটারই প্রধান। ধর্ম সম্বন্ধে রোমের জনসাধারণ অত্যন্ত উদার ছিল। দলে দলে লোকে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। প্রথম দিকে রোমের সম্রাটরাও এই নতুন ধর্ম প্রচারে বাধা দেননি। কিন্তু পরে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যই সম্রাটরা খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর রোম-সাম্রাজ্যে এই ধর্ম প্রচারের আর কোন বাধা রইল না। রোম-সাম্রাজ্যের সব জায়গায় খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।

● ১। যীশুখ্রীষ্টের প্রচারিত ধর্মের নাম খ্রীষ্টধর্ম। বাইবেল খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ।

২। সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের আমলে রোম-সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

১। রোম নগরী ও রোম-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। রোম ও কার্থেজের মধ্যে কেন যুদ্ধ দেখা দেয়?

৩। প্রথম পিউনিক যুদ্ধের ফলাফল কি?

৪। প্রাচীনকালে রোমের সমাজ কেমন ছিল?

৫। প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে কেন বিবাদ শুরু হয়? কিভাবে প্লেবিয়ানরা এই বিবাদে জয়লাভ করে?

৬। রোমের নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে কি জান?

৭। রোমের ক্রীতদাসদের সম্বন্ধে কি জান?

৮। রোমের ক্রীতদাসরা কেন বিদ্রোহ করে? এই বিদ্রোহের ফল কি হয়?

৯। রোমের প্রজাতন্ত্র কেন ধ্বংস হয় ?

১০। জুলিয়াস সীজার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১১। রোমের সাম্রাজ্য কিভাবে গড়ে ওঠে? এই সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ?

১২। রোম-সাম্রাজ্যের পতন কি ভাবে হয় ?

১৩। রোমে কিভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হয় ?

১৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে কারা রোম শহর পত্তন করেন? (খ) দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের সেনাপতির নাম কি? দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের ফলাফল কি? (গ) প্যাট্রিশিয়ানরা কি কি সুযোগ পেত? (ঘ) স্পার্টাকাস সম্পর্কে কি জান? (ঙ) জুলিয়াস সীজারের আগে কে রোমের শাসক ছিলেন? সীজার রোমে ফিরে এলে তিনি কি করেন? (চ) রোমের কয়েকজন সম্রাটের নাম লেখ। (ছ) যীশুর মূল ধর্মমত কি? (জ) যীশু কেন ও কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন?

১৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) ফিনিশীয় বণিকদের — নামে একটি বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। (খ) কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি — গঠিত হয়। (গ) থেসালির — তাদের নেতৃত্ব দেন। (ঘ) ৪৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের ১৫ই মার্চ ষড়যন্ত্রকারীরা সেনেটের ভিতরই — হত্যা করেন। (ঙ) পরে — আক্রমণে রোম-সাম্রাজ্য একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। (চ) রোমে যারা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন তাদের প্রধান ছিলেন — ও —।

১৬। সঠিক উত্তরটিতে √ এই চিহ্ন দাও :—

(ক) প্রথম যুগের রোমের সম্রাটরা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন/ছিলেন না। (খ) রোমানরা স্পার্টাকাস ও প্রায় দু হাজার ক্রীতদাসকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে/করে না। (গ) রোমের ধনীরা ক্রীতদাসদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করত/করত না। (ঘ) রোমের নাগরিক অধিকার গর্বের বস্তু ছিল/ছিল না। (ঙ) যীশু জাতিতে ইহুদি ছিলেন/ছিলেন না।

নবম অধ্যায়

চীন

১ম পাঠঃ শাঙ্ বংশ ; কনফুসিয়াস ও তাঁর শিক্ষা ; চীনের প্রাচীর

সুমের এবং মিশরের মত প্রাচীনকালে চীনদেশেও কতকগুলো ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পরে শাঙ্ রাজবংশ এইসব ছোট ছোট রাষ্ট্র একত্রিত করে বড় রাজ্য গড়ে তোলে। সম্ভবত কনফুসিয়াসের 'সু চিঙ' অথবা 'ইতিহাস গ্রন্থ'-ই চীনের প্রাচীনতম ইতিহাসের বই। এই বই থেকে সে-সময়কার চীনের অনেক কথা জানতে পারা যায়। তবে সেই সব কাহিনীর অনেক কথাই বিশ্বাস করা যায় না।

শাঙ্ রাজাদের আমলে চীনের খুব উন্নতি হয়। শাঙ্ রাজারা হোয়াং হো প্রভৃতি নদীর বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করেন। চীনের সাহিত্যেরও এই সময়ে খুব উন্নতি হয়।

শাঙ্ বংশের রাজা উয়ি ভগবানে বিশাস করতেন না। তাঁর আমলে চীনের ধর্মে কিছু পরিবর্তন হয়। শাঙ্ রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন চৌ সিন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও বোকা। চৌ রাজবংশের উ ওয়াঙের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি রাজপ্রাসাদের মধ্যেই আগুনে পুড়ে মারা যান।

শাঙ্ রাজবংশের পতনের পর চৌ রাজবংশ ১১৫০ থেকে ২৫৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত চীনে রাজত্ব করে। এই রাজবংশের দুর্বলতার সুযোগে চীন আবার নানা রাজ্যে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

কনফুসিয়াস ও তাঁর শিক্ষা— চীনের প্রধান ধর্মপ্রচারক কনফুসিয়াস সানতুং অঞ্চলে ৫৫১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চীনের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নিয়ে তিনি তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। প্রথম জীবনে তিনি লু-এর শাসনকর্তার অধীনে কাজ করতেন। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি ধর্মপ্রচারে মন দেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব গ্রন্থের মধ্যে বুক অফ হিস্ট্রি', 'স্প্রিং অ্যাণ্ড অটাম্ অ্যানালস্' 'বুক অফ ওডস্', 'বুক অফ চেঞ্জেস্' এবং 'বুক অফ রাইটস্'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। 'অ্যানালেক্টস' গ্রন্থে তাঁর শিষ্যরা তাঁর উপদেশ সঙ্কলন করেন। চীনের সভ্যতার সঙ্গে এই সব

গ্রন্থের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। চীনদেশের জনসাধারণের জীবনের উপরও এই সব গ্রন্থের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কনফুসিয়াসের শিষ্যরা চীনদেশের সব জায়গায় তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। ৪৭৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ৭৩ বছর বয়সে কনফুসিয়াসের মৃত্যু হয়।

কনফুসিয়াসের প্রচারিত ধর্মের মূল কথা ভদ্র আচার-ব্যবহার ও উন্নত ধরনের নৈতিক জীবনযাপন। সামাজিক রীতি-নীতির উপরও তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি দেন। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের সম্মান দেখানো এবং পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাবের উপর কনফুসিয়াস বিশেষ জোর দেন। প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্যও তিনি সকলকে উপদেশ দেন। তিনি সবাইকে বলতেন যে, যেমন ব্যবহার নিজে পছন্দ কর না পরের প্রতি কখনও তেমন ব্যবহার করো না।



কনফুসিয়াস

কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে শিক্ষার মূল্য অত্যন্ত বেশি। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন। চীনের শাসনকর্তারা কনফুসিয়াসের আদর্শে দেশে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করেন।

'ঈশ্বর এক' এই মতবাদে বিশ্বাসী হলেও কনফুসিয়াস কেবল এর উপরই বেশি জোর দেননি। মানুষ, তার বাস্তব জীবন ও পরিবেশের উপরই কনফুসিয়াসের বেশি আস্থা ছিল।



চীনের প্রাচীর

চীনের প্রাচীর—প্রাচীন যুগে পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় চীনের প্রাচীর। যাযাবর হূণদের আক্রমণের হাত থেকে চীনের সীমান্ত-অঞ্চল রক্ষার

জন্য চীনের প্রাচীর তৈরি করা হয়। কয়েক শ বছর ধরে এই বিরাট প্রাচীর তৈরির কাজ চলে। রাজা শি হুয়াঙের রাজত্বকালে ২২১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে প্রাচীর তৈরির কাজ শেষ হয়। পাহাড়-পর্বত, নদী, মরুভূমি, মালভূমি ও সমতলভূমির উপর প্রায় ২৩২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রাচীর এখনও দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীরে মাঝে মাঝে দুর্গ এবং বুরুজও তৈরি করা হয়। এক বিশাল আকৃতির ড্রাগনের মত এই প্রাচীর চীনের সীমান্তকে সতর্কভাবে পাহারা দিত।

●১। শাঙ্ রাজাদের আমলে ছোট ছোট রাজ্য মিলে একটা রাজ্য হয়। এই রাজাদের আমলে দেশের অনেক উন্নতি হয়।

২। চীনের প্রধান ধর্মপ্রচারক কনফুসিয়াস। তাঁর ধর্মমতে মানুষ, তার বাস্তব জীবন ও পরিবেশের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

৩। হূণ আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য চীনের রাজারা কয়েক শ বছর ধরে ২৩২০ কিলোমিটার লম্বা চীনের প্রাচীর তৈরি করেন।

২য় পাঠ : চিঙ্ সাম্রাজ্য

কনফুসিয়াস এবং অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের চেষ্টায় চীনের জনসাধারণের চিন্তাধারা ও ধর্মবিশ্বাসে অনেক পরিবর্তন হয়। রাজনৈতিক জীবনেও এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। সমগ্র চীনদেশে তখন রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা হয়। বিভিন্ন স্থানের ছোট ছোট রাজ্য জয় করে চিঙ্ রাজবংশ প্রায় সমগ্র দেশ নিজেদের অধিকারে আনে। চিঙ্ রাজবংশ থেকেই দেশের নামও হয় চীন। চিঙ্ রাজবংশের শক্তিশালী রাজা শি হুয়াঙ ছোট ছোট রাজ্যের রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ২২১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সমস্ত দেশ নিজের অধিকারে আনেন। শি হুয়াঙই চীন-সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে চীন সাম্রাজ্যের গৌরব বেড়ে যায়। এই রাজবংশ ২৫৫ থেকে ২০৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে। ২০৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে হান রাজবংশের হাতে চিঙ্ বংশের পরাজয় হয়।

●১। চিঙ্ রাজারা ছোট ছোট রাজ্য জয় করে প্রায় গোটা দেশে চিঙ্ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। চিঙ্ রাজবংশ থেকেই দেশের নাম হয় চীন।

অনুশীলনী

১। শাঙ্ রাজবংশ কোথায় রাজত্ব করতেন ?

২। শাঙ্ রাজারা চীনদেশের জন্য কি কি করেছিলেন ?

৩। চীনদেশের প্রাচীনতম ইতিহাসের বই-এর নাম কি ?

৪। শাঙ্ রাজবংশের শেষ রাজার নাম কি ? তিনি কিভাবে মারা যান ?

৫। কনফুসিয়াস কে ছিলেন ? প্রথম জীবনে তিনি কি করতেন ? তাঁর রচিত বইগুলোর নাম কর।

৬। কনফুসিয়াসের ধর্মের মূল কথা কি ? অ্যানালেক্টস গ্রন্থে কি ছিল ?

৭। চীনের প্রাচীর কেন তৈরি হয়েছিল ? কোন্ রাজার আমলে প্রাচীর তৈরির কাজ শেষ হয় ? প্রাচীরের দৈর্ঘ্য কত ?

৮। চিঙ্ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কি জান ? চীনদেশের নাম চীন কেন ?

৯। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) — রাজাদের আমলে চীনের খুব উন্নতি হয়। (খ) শাঙ্ বংশের রাজা — ভগবানে বিশ্বাস করতেন না। (গ) কনফুসিয়াস — অঞ্চলে — জন্মগ্রহণ করেন। (ঘ) মানুষ, তার — জীবন ও — উপরই — বেশি আস্থা ছিল। (ঙ) চীনের প্রাচীরে মাঝে মাঝে — এবং — ও তৈরি করা হয়। (চ) — চীন সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

দশম অধ্যায়

প্রাচীন ভারত

১ম পাঠ : আর্যদের ভারত-আগমন

যারা সাধারণত আর্যভাষায় কথা বলত তারা ইতিহাসে আর্য নামে পরিচিত। আর যারা আর্যভাষায় কথা বলত না তারা অনার্য নামে পরিচিত হত।

সম্ভবত যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে আসে। মনে হয় আর্যরা প্রাচীনকালে পশ্চিম-এশিয়ায় বাস করত। পরে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। তখন তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের একটি দল উত্তর-পশ্চিম দিকের পাহাড়ের পথে

ভারতে প্রবেশ করে। প্রথমে তারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে। পরে ধীরে ধীরে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল অধিকার করে তার নাম রাখে আর্যাবর্ত। শেষে তারা দক্ষিণ ভারতও অধিকার করে।

● যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়া থেকে আর্যরা ভারতে আসে। প্রথমে তারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাস করতে থাকে।

২য় পাঠ: বেদ

আর্যদের প্রাচীনতম ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। আর্যরা বেদকে কোন মানুষের রচনা বলে মনে করত না। তারা বিশ্বাস করত যে বেদের বাণী দেবতার বাণী। বেদ চারভাগে বিভক্ত —ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ঋক্‌বেদে মন্ত্র, সামবেদে গান, যজুর্বেদে যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি এবং অথর্ববেদে সৃষ্টির রহস্য, চিকিৎসা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি বেদের আবার চারটি ভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতায় যাগযজ্ঞের মন্ত্র, ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের নিয়মকানুন, আরণ্যকে সন্ন্যাসধর্ম ও উপনিষদে গভীর দার্শনিক কথার আলোচনা করা হয়েছে। উপনিষদই বৈদিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা।

● আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ।

৩য় পাঠ: আর্যদের প্রাচীন সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি

সমাজ—আর্যদের সমাজ ছিল পরিবারকেন্দ্রিক। পিতা ছিলেন পরিবারের কর্তা। আর্যদের মধ্যে প্রথমে বর্ণভেদ ছিল না। বিজয়ী আর্য ও পরাজিত অনার্যদের মধ্যে ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফরসা রঙের আর্য ও কালো রঙের অনার্য এই দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। প্রথমে গায়ের রঙের জন্য আর্য ও অনার্য বর্ণ-বিভাগ হয়েছিল। কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় গুণ ও কাজের জন্যই সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারভাগে ভাগ করা হয়। জপ, তপ, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তারা ব্রাহ্মণ। যারা যুদ্ধ করত তারা ক্ষত্রিয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকেরা বৈশ্য নামে

পরিচিত হয়। সমাজের এই তিন শ্রেণীর সেবা করার জন্য যারা রইল তাদের শূদ্র বলা হত। কিন্তু গুণ ও কাজ অনুসারে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হলেও বৈদিক যুগের প্রথমদিকে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ও বিবাহ ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। তবে বৈদিক যুগের শেষে জাতিভেদ-প্রথা কঠোর হয়।

আর্যদের সামাজিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য চতুরাশ্রম। এই চারটি আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আর্যরা এই চারটি আশ্রম মেনে চলত।

বৈদিক আর্যদের সামাজিক জীবন ছিল অত্যন্ত সরল। এই সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সততা, ধর্মে বিশ্বাস ও জ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা। বৈদিক সমাজে নারীদের খুব সম্মান ছিল। তাঁরা পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতেন এবং স্বামীর সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও যোগ দিতেন। তাঁরা লেখাপড়া শিখতেন এবং শাস্ত্র আলোচনাও করতেন। অনেক নারী ব্যায়াম, খেলাধূলা ও যুদ্ধবিদ্যাও জানতেন।

আর্যদের রাজনৈতিক অবস্থা—পরিবার ছিল বৈদিক আর্যদের রাজনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম, আবার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি বিশ বা জন গড়ে উঠত। গ্রামের প্রধানকে গ্রামণী ও বিশের প্রধানকে বিশপতি, রাজা বা রাজন্ বলা হত। রাজা রাজ্যের শাসনক্ষমতা ভোগ করতেন। রাজার হাতে প্রচুর ক্ষমতা থাকলেও তাঁকে সভা ও সমিতি নামে জনসাধারণের দুটি প্রতিষ্ঠানের মত মেনে চলতে হত।

রাজা ছিলেন প্রধান বিচারপতি ও সেনাপতি। রাজ্যশাসন, যুদ্ধ-পরিচালনা, বিচার ও কর আদায় করাই ছিল রাজার প্রধান কর্তব্য। রাজ্যের শাসন ভালভাবে চালাবার জন্য রাজার অনেক কর্মচারী ছিল। কোন কোন রাজ্যে রাজার শাসনের বদলে গণতন্ত্র ছিল। বৈদিক যুগের শেষদিকে শক্তিশালী রাজ্যগুলো দুর্বল ছোট ছোট রাজ্য দখল করে নেয়। শক্তিশালী রাজ্যের শাসকরা দিগ্বিজয়ে বের হতেন। দেশ জয় করে তাঁরা রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ করতেন।

ধর্ম—বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যদের ধর্ম ছিল সহজ ও সরল। তারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পূজা করত। আগুন জ্বেলে ঘি প্রভৃতি দিয়ে তারা যজ্ঞ করত। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্রও পড়ত।

কোন কোন যজ্ঞে পশুবলি হত। অনেক দেব-দেবীর পূজা করলেও আর্যদের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর এক। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে মূর্তির পূজা হত না। পরে আর্যরা মূর্তি-পূজা শুরু করে। ধীরে ধীরে যজ্ঞ এবং পূজার নিয়ম-কানুন জটিল হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে পুরোহিতের দেখা দেয়।

● ১। আর্য-সমাজ ছিল পরিবারকেন্দ্রিক।

২। আর্য-সমাজে চারটি শ্রেণী ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

৩। আর্য-সমাজে নারীদের খুব সম্মান ছিল।

৪। কয়েকটি গ্রাম মিলে একটা বিশ গড়ে উঠত। বিশের প্রধানকে রাজা বলা হত।

৫। আর্যরা 'ঈশ্বর এক'—এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। বৈদিক যুগের শেষ দিকে মূর্তি-পূজা শুরু হয়।

৪র্থ পাঠ : মহাকাব্য

আর্যদের সময়ে রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়। মহাকবি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের কাহিনী বলা হয়েছে। রামের বনে যাওয়া, তারপর সীতাকে চুরি করার জন্য রাবণের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ, আবার অযোধ্যার সিংহাসনে বসা ও সীতাকে বনবাসে পাঠানো খুব সুন্দর করে রামায়ণে বলা হয়েছে। সাহিত্য হিসেবে রামায়ণ খুব উঁচু ধরনের। রামায়ণ ভারতবাসী হিন্দুর কাছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মত। তাদের কাছে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র ভগবান।

রামায়ণের পরের যুগে বেদব্যাস মহাভারত মহাকাব্য রচনা করেন। এখানে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এবং যুদ্ধে কৌরবদের পরাজয়ের কাহিনী বলা হয়েছে। মহাভারতের মত এত সুন্দর সাহিত্য পৃথিবীতে আর রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আলাদাভাবে গীতায় সঙ্কলিত হয়েছে। গীতাকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। গীতা হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের কাছে ভগবানের অবতার।

সাহিত্য হিসেবে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটি তুলনাহীন। ভারতবাসীর ঘরে ঘরে এ দুটি মহাকাব্য আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়া হয়। কাহিনী ছাড়াও সে যুগের সমাজ, অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রার ছবি আমরা এই দুই মহাকাব্যে পাই।

১। আর্যদের সময়ে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি মহাকাব্য রচিত হয়।

২। রামায়ণ লেখেন বাল্মীকি, মহাভারত লেখেন বেদব্যাস।

৫ম পাঠঃ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান

বৈদিক যুগের ধর্ম জটিল হয়ে পড়লে সমাজে নানা অনাচার দেখা দেয়। ধর্মের অনাচার দূর করার জন্য ধর্ম-আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি হয়।

জৈনধর্ম—জৈনধর্মের মূল প্রচারক ছিলেন পার্শ্বনাথ। তবে মহাবীরের প্রচারের ফলে এই ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ছেড়ে তপস্যা শুরু করেন। তের বছর তপস্যার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি মগধ, অঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করেন। প্রায় বাহাত্তর বছর বয়সে পাটনা জেলার পাবায় তাঁর মৃত্যু হয়।



মহাবীর

হিংসা না করা, মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, লোভ না করা —এ-ই হল জৈনধর্মের মূল নীতি। মহাবীর এই মূল নীতির কিছু অদল-বদল করেন। জৈন ধর্মমতে আত্মার মুক্তির জন্য সৎজ্ঞান, সৎকর্ম ও সদ্ব্যবহার এই তিনটি পথের কথা বলা হয়েছে। ভাল কাজ ও কঠোর তপস্যায় আত্মার উন্নতি করে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে আর জন্ম না নেওয়ার ইচ্ছাই ছিল জৈনধর্মের মূল কথা। জৈনরা ভগবানে বিশ্বাস করে না। বেদকে তারা ভগবানের বাণী মনে করে না। তারা জাতিভেদ মানে না। অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র জৈনদের প্রধান সাহিত্য।

বৌদ্ধধর্ম—প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে গৌতম বুদ্ধের নাম ছিল সিদ্ধার্থ।

বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে একজন বুড়ো, একজন রোগী, একটি মড়া এবং একজন সন্ন্যাসী গৌতমের মনে পরিবর্তন আনে। তাঁর বিশ্বাস হয় যে একমাত্র সন্ন্যাসীরাই এ জগতে সুখী। তখন মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি সন্ন্যাসী হন।



বুদ্ধদেব

দীর্ঘদিন তপস্যার পর গৌতম দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তাঁর নাম হয় বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হয় বৌদ্ধধর্ম। তাঁর শিষ্যদের বৌদ্ধ বলা হয়। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর তিনি সারনাথ, বৈশালী, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার করেন। ৮০ বছর বয়সে গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে তাঁর মৃত্যু বা মহানির্বাণ হয়।

বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ধর্মপ্রচারক। বুদ্ধদেবের মতে মানুষের দুঃখকষ্টের কারণ অজ্ঞতা ও সংসারের সকল জিনিসের প্রতি লোভ। ভাল কাজ করে আত্মার উন্নতি করলে মানুষ এই সব দুঃখকষ্ট থেকে রেহাই পেতে পারে। আত্মার এই মুক্তিকে নির্বাণ বলা হয়। অহিংসা

এবং জীবে প্রেমই বৌদ্ধধর্মের মূল কথা। বৌদ্ধরা জাতিভেদ মানত না। তারা ভগবানেও বিশ্বাস করত না।

বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রি-পিটক। ভারতে ও ভারতের বাইরের বহুলোক এই সহজ ও সরল বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে।

● ১। মহাবীর জৈনধর্মের প্রচারক ছিলেন।
২। বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

৬ষ্ঠ পাঠঃ প্রাচীন সাম্রাজ্য

মৌর্যবংশ—নন্দবংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করে ৩২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসেন। তাঁর বংশের নাম মৌর্যবংশ।

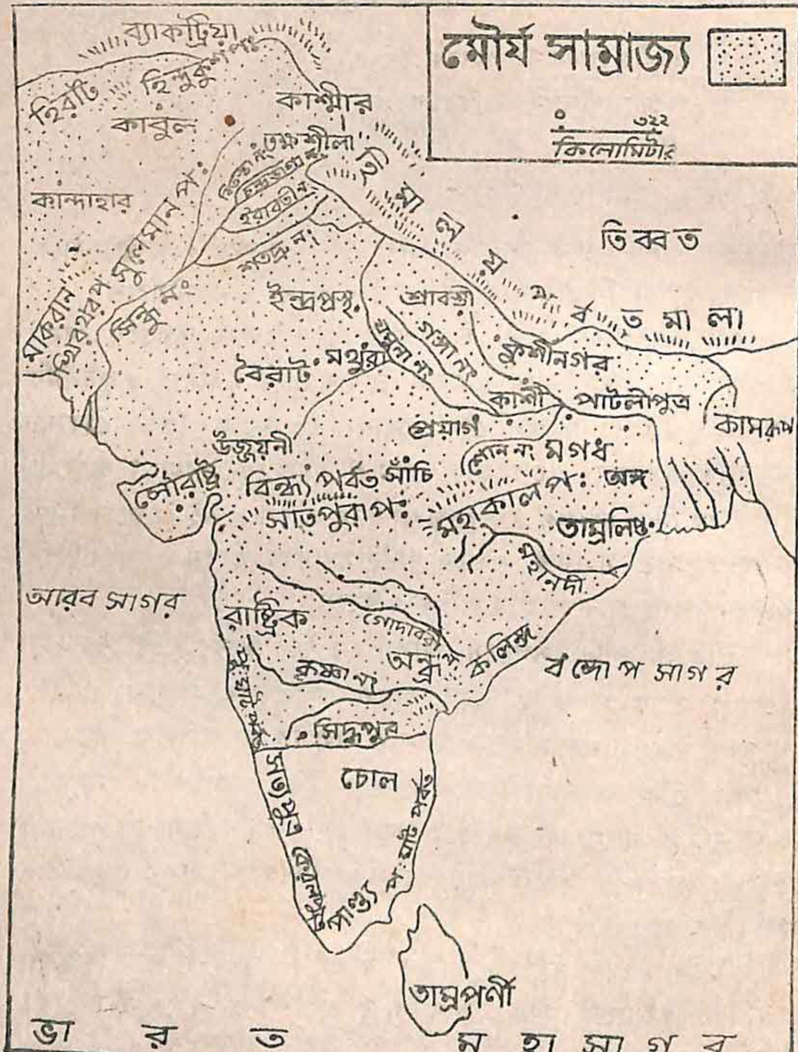
সম্ভবত মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্তকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। চাণক্য নামে তক্ষশীলার একজন ব্রাহ্মণ তাঁকে যুদ্ধবিদ্যা ও কুটনীতি শেখান। পরে একজন গ্রীক সেনাপতির কাছে তিনি গ্রীকদের যুদ্ধনীতিও শেখেন। চাণক্যের পরামর্শে হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলের লোকদের নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত এক সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদের নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত অতি সহজেই মগধের সিংহাসন দখল করেন। পরে তিনি গ্রীকদের কাছ থেকে পাঞ্জাব অধিকার করেন।

গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস আবার ভারত জয়ের চেষ্টা করেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে পরাজিত করে কাবুল, কান্দাহার, মকারান, হিরাট, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান অধিকার করেন। একজন গ্রীক রাজকুমারীকেও চন্দ্রগুপ্ত বিয়ে করেন। সেলুকাস মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীকদূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় পাঠান। তারপর চন্দ্রগুপ্ত সৌরাষ্ট্র জয় করেন এবং দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

চব্বিশ বৎসর চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত ও পারস্যের সীমা থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক সিংহাসনে বসেন।

অশোক—সিংহাসনে বসার কয়েক বৎসর পরে অশোক কলিঙ্গ (বর্তমান উড়িষ্যা) জয় করেন। যুদ্ধে দু-দলের অনেক সৈন্য মারা যায়। এই যুদ্ধের পর অশোকের মনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে।



তাঁর মনে হয় রাজ্যজয় থেকে ধর্মবিজয় অনেক বড়। তাই মানুষের হৃদয় জয়ের জন্য তিনি প্রেম ও অহিংসা ধর্ম প্রচারের আদর্শ গ্রহণ করেন।

অশোকের মনের এই পরিবর্তন তাঁর রাজ্যশাসনকেও প্রভাবিত করে। প্রজাদের তিনি নিজের ছেলের মত মনে করতেন। তাদের উন্নতির জন্য তিনি ধর্ম-মহামাত্র নামে একদল রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। প্রজাদের সুবিধার জন্য কুয়ো কাটানো, ধর্মশালা তৈরি, পথের দুপাশে গাছ লাগানো, মানুষ ও পশুর জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থায় তাঁর মানবপ্রেমের পরিচয়। লোকশিক্ষা ও ধর্ম-প্রচারের জন্য অশোক পাহাড়ের গায়ে ও পাথরের স্তম্ভে বহু উপদেশ খোদাই করেন।



অশোক

অশোকের এইসব উপদেশ সাধারণত ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা। এই সব লিপি থেকে অশোকের ধর্মমত, উপদেশ ও নানাকাজ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। অশোক অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ, সুন্দর সুন্দর পাথরের স্তম্ভ ও গুহা তৈরি করান। চন্দ্রগুপ্তের আমলের রাজপ্রাসাদ ছিল কাঠের। অশোক তাঁর রাজধানী পাটলি-পুত্রে পাথরের রাজপ্রাসাদ তৈরি করান।



ব্রাহ্মীলিপি

অশোক কেবল নিজের রাজ্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেননি। তিনি ভারতের অন্যান্য রাজ্য, পশ্চিম-এশিয়ার অনেক রাজ্য, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ধর্মপ্রচারের জন্য লোক পাঠান। অশোকের ভাই (কারও মতে ছেলে) মহেন্দ্র এবং মেয়ে সংঘমিত্রা ধর্মপ্রচারের জন্য সিংহলে যান।

অশোক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩৬ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সর্বকালের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতন হয়।

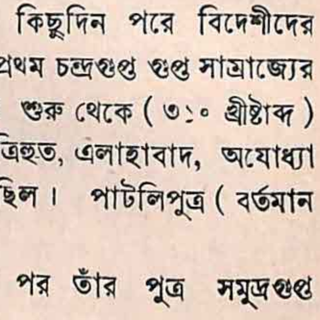
কণিষ্ক—কুষাণরা মধ্য-এশিয়া থেকে এসে উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকার করে। কুষাণ-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তিনি বীর যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। প্রাচীন ভারতের আর কোন বিদেশী শাসক রাজ্যশাসনে তাঁর মত কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চীন সাম্রাজ্যের কাশগড়, খোটান প্রভৃতি স্থান তিনি জয় করেন। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার)।

বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য কণিষ্ক আন্তরিক চেষ্টা করেন। তিনি ভারতের বাইরে নানা জায়গায় প্রচারক পাঠিয়ে বুদ্ধদেবের বাণী প্রচার করেন। নিজে বৌদ্ধ হলেও কণিষ্ক অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে উদার ছিলেন। তাঁর মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি ছাড়াও হিন্দু, গ্রীক ও পারসীক দেব-দেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

কণিষ্ক অনেক বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার তৈরি করান। কণিষ্কের সময়ে সাহিত্য ও শিল্পের খুব উন্নতি হয়।

গুপ্তবংশ—মৌর্য সাম্রাজের পতনের পর বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতের বিভিন্ন স্থান জয় করে নেয়। কিছুদিন পরে বিদেশীদের পরাজিত করে গুপ্ত-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজত্বকালের শুরু থেকে (৩২০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারত ইতিহাসের এক গৌরবের যুগ। ত্রিহুত, এলাহাবাদ, অযোধ্যা ও দক্ষিণ-বিহার তাঁর রাজ্যের অধীনে ছিল। পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা) তাঁর রাজধানী ছিল।

সমুদ্রগুপ্ত—প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী এলাহাবাদ-স্তম্ভ শিল-লিপিতে পাওয়া যায়। প্রথমে তিনি আর্যাবর্তের রুদ্রদেব, নাগদত্ত, মাতিল, অচ্যুত, গণপতি, চন্দ্র র্মণ, বলবর্মণ প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করেন। তারপর তিনি মধ্যভারতের রাজ্যগুলো জয় করেন।



সমুদ্রগুপ্ত

উত্তর ও মধ্যভারত জয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ-ভারতে অভিযান

করেন। দক্ষিণ কোশলের রাজা বিষ্ণুগোপ, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ এবং দমন, ধনঞ্জয়, উগ্রসেন প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করেন।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের ফলে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সীমা হয় উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পশ্চিমে যমুনা থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ। সমতট (পূর্ববঙ্গ), আসাম ও নেপালেও গুপ্তদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ভারতের সীমার বাইরে শক ও কুষাণ রাজারা এবং শ্রীলঙ্কার রাজা মেঘবর্ণ তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করেন।

তাঁর আমলে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির খুব উন্নতি হয়। শক্তিশালী সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা যায়। এই সময়ে হিন্দুধর্ম আবার জনপ্রিয় হয়। তিনি কয়েকবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ থাকলেও তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য—সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসেন। তিনি নাগ, কদম্ব, বাকাটক প্রভৃতি রাজবংশের সঙ্গে আত্মীয়তা করে গুপ্ত রাজবংশের শক্তি আরও বাড়িয়ে তোলেন। মালব, গুজরাট, সৌরাষ্ট্রের শকদের জয় করে তিনি সাম্রাজ্যের সীমা আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। শাসনের সুবিধার জন্য তিনি উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। পাটলিপুত্রই ছিল রাজ্যের প্রধান রাজধানী। তাঁর রাজত্বকালে চীনের পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শিল্প ও সাহিত্য খুব ভালবাসতেন। অনেক বিদ্বান ও পণ্ডিত তাঁর রাজসভায় ছিলেন। কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন ছিলেন তাঁর রাজসভার গৌরব। হরিষেণ, বীরসেন, বিশাখদত্ত, বসুবন্ধু, আর্যভট্ট ও বরাহমিহির দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গৌরবের যুগ।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর কুমারগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা। তিনি হূণজাতির হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা করার বিভিন্ন ব্যবস্থা নেন। তাঁর মৃত্যুর পর গুপ্তবংশের পতন শুরু হয়। অবশেষে দুর্বল রাজাদের আমলে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

● ১। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল আফগানিস্তানের সীমানা থেকে বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় থেকে মহীশূর পর্যন্ত।

২। সম্রাট অশোক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা। সাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৩। ভারতের বিদেশী শাসকদের মধ্যে কণিষ্ক সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

৪। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫। সমুদ্রগুপ্তের আমলে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা এবং পশ্চিমে যমুনা থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে।

৬। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের আমলে গুপ্তসাম্রাজ্যের আয়তন আরও বেড়ে যায়। কবি কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন তাঁর রাজসভার গৌরব ছিলেন।

৭ম পাঠ : প্রাচীন বঙ্গদেশ

প্রাচীনকালের বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমানা ঠিকভাবে বলা খুব কঠিন। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে প্রাচীন বাংলার সীমা ছিল —উত্তরে হিমালয়, নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য ; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ; উত্তর-পশ্চিমদিকে দ্বারবঙ্গ ; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া জয়ন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের পাহাড় ; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের পাহাড় ও জঙ্গল ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই গোটা অঞ্চল রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী প্রভৃতি রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

বৈদিক যুগের প্রথমদিকে আর্যরা বঙ্গদেশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। সেজন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আর্য অঞ্চলের বাইরের লোকদের দস্যু বলা হয়েছে। এইসব লোকের মধ্যে পুণ্ড্র জাতির নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন সাহিত্যে বঙ্গদেশের লোকের সম্পর্কে এই প্রথম উল্লেখ। তবে রামায়ণ, মহাভারত ও ধর্মসূত্রে বঙ্গদেশের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে উত্তরবঙ্গের পুণ্ড এবং মধ্য পূর্বাঞ্চলের 'বঙ্গ'দের

আর্য-সমাজের বাইরের জাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। রামায়ণ ও মহাভারতে অনেকবার বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। মহাভারতে পুণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম প্রভৃতি স্থানে ভীমের বিজয়ের কাহিনী পাওয়া যায়। জৈন আচরঙ্গ-সূত্রে বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চলকে বনময় এবং সেখানের লোকদের দস্যু বলা হয়েছে। বৌদ্ধগ্রন্থ সংযুক্ত নিকায় এবং তেলপত্তজাতকে সুহ্ম ও তার রাজধানী সেতকের উল্লেখ আছে। মিলিন্দ পঞ্‌হো গ্রন্থে এবং নাগার্জুনকোণ্ডার অনুশাসনে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। তবে এই সব গ্রন্থে বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমানার কোন উল্লেখ নেই।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় থেকেই বঙ্গদেশের সত্যিকাবের ইতিহাস পাওয়া যায়। গ্রীক লেখকরা গঙ্গারিডই জাতিকে গঙ্গানদীর পূর্বতীরের অধিবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। জৈন ও বৌদ্ধ কিংবদন্তীতে মৌর্য বংশের সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। চীনদেশের পর্যটকরাও বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায় অশোকের সময়ের স্থাপত্যের কথা উল্লেখ করেন। মহাস্থানগড়ে পাওয়া একটি মৌর্যযুগের লিপিতে পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ আছে। এজন্য মনে হয় মৌর্যদের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগাযোগ ছিল। মহাস্থানগড়ে পাওয়া শুঙ্গ আমলের পোড়ামাটির নানা নমুনা বঙ্গদেশে শুঙ্গ শাসনের প্রমাণ দেয়।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বঙ্গদেশে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। চন্দ্ররাজের স্তম্ভলিপি, সমুদ্রগুপ্তের লিপি এবং শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপি থেকে পূর্ববঙ্গের সমতট রাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গের পুষ্করণ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুষ্করণ রাজ্যে (বর্তমান বাঁকুড়া) সিংহবর্মণ ও চন্দ্রবর্মণ রাজত্ব করতেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে চন্দ্রবর্মণের উল্লেখ আছে। সমতট ছিল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীনে একটি রাজ্য। সমুদ্রগুপ্তের সময় প্রায় গোটা বঙ্গদেশ তাঁর অধীনে আসে। সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের সময় সমগ্র উত্তরবঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে পরিচিত ছিল।

● ১। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যদের সঙ্গে বঙ্গদেশের পরিচয় ছিল না।

২। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে বঙ্গদেশের সঙ্গে আর্যদের পরিচয় হয়। বঙ্গদেশ মৌর্য, শুঙ্গ ও গুপ্তদের অধীনে ছিল।

৮ম পাঠঃ বিদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ (মধ্য-এশিয়া)

প্রাচীনকাল থেকেই মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে এই সব অঞ্চলে ভারতীয়রা উপনিবেশও গড়ে তোলে।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও বাণিজ্যের আদান-প্রদানের জন্য মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার হয়। কুষাণ রাজাদের আমলে এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। এই যুগেই কাস্পিয়ান সাগর ও চীনের প্রাচীরের মাঝামাঝি জায়গায় মধ্য-এশিয়ার খোটান, কাশগড়, তুরফান প্রভৃতি স্থানে বহু ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। পরে গোবি মরুভূমির বালির নিচে এই সব উপনিবেশ ধ্বংস হয়ে যায়। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন্-সাঙ্ ভারতে আসার সময় ঐ সব অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করেন।

মধ্য-এশিয়ার এই সব অঞ্চলে ভারতের পণ্যদ্রব্য খুব জনপ্রিয় ছিল। সেজন্য বাণিজ্যের পরিমাণও যথেষ্ট বেড়ে যায়। বিভিন্ন জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ভারতীয় সমাজেও অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। ভারতীয়দের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অনেকে মনে করেন যে মধ্য-এশিয়ার পথেই বৌদ্ধধর্ম চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। পরে ভারতীয় সঙ্গীত এবং চিকিৎসাশাস্ত্র ও গণিতও চীনদেশে জনপ্রিয় হয়। ভারতীয় গুহা-মন্দির তৈরি, মূর্তি গঠন ও ছবি আঁকার রীতিও চীন ও অন্যান্য দেশকে প্রভাবিত করে। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল খোঁড়ার পর অনেক বৌদ্ধ-বিহার, হিন্দু ও বৌদ্ধ মঠ-মন্দির ও বুদ্ধমূর্তি এবং হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এসব বৌদ্ধ বিহার, মঠ, মন্দির ও মূর্তিতে ভারতীয় প্রভাব স্পষ্ট।

● প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার ধর্ম, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। পরে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয়রা উপনিবেশও স্থাপন করেন।

৯ম পাঠঃ বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ

মেগাস্থিনিস—চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার গ্রীক-দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে সে-যুগের উত্তর-ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। ভারতবাসীর জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও সরল। সমাজে তখন মামলা-মোকদ্দমা, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি ছিল না বললেই চলে। এমন কি রাতেও ঘরের দরজা খোলা রেখে লোকে নিশ্চিন্তে ঘুমোত। মেগাস্থিনিসের মতে ভারতের জনসাধারণ ছিল পরিশ্রমী, শান্তিপ্রিয় ও অল্পে সন্তুষ্ট।

তখন সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক আদান-প্রদান ছিল না। মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সম্ভবত হিন্দু-সমাজের বর্ণ-বিভাগ তিনি বুঝতে পারেননি। তাঁর মতে সমাজে দার্শনিক, কৃষক, পশু-পালক ও শিকারী, যোদ্ধা, শিল্পী ও ব্যবসায়ী, পরিদর্শক ও সভাসদ এই সাতটি ভাগ ছিল।

কৃষি ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। বেশির ভাগ ভারতবাসীই গ্রামে বাস করত। খাদ্যের অভাব ছিল না বলে তাদের শরীর ও স্বাস্থ্য ছিল খুব চমৎকার। নানা ধরনের শিল্পের কাজে তারা দক্ষ ছিল। বিয়ের জন্য মেয়ের বাবার কাছ থেকে গরু নিয়ে মেয়ে নেওয়া হত। বিয়ে দিতে না পারলে গরীব মানুষরা মেয়ে বেচেও দিত। মেগাস্থিনিসের মতে ভারতবাসীরা লিখতে পড়তে জানত না। তবে এ-কথা সত্য নয়। অশোকের লিপি থেকে বোঝা যায় যে, সে-যুগের লোকেরা লেখাপড়া জানত। মেগাস্থিনিস দিওনুসস ও হিরাক্লিস নামে দুজন দেবতার উল্লেখ করেছেন। দিওনুসসের সম্মানে শোভাযাত্রা বের হত। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় মনে হয় দিওনুসস শিব আর হিরাক্লিস কৃষ্ণ।

ফা-হিয়েনের বিবরণ—চীনা-পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণে গুপ্ত-যুগের সমাজের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। গুপ্ত-যুগে সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল, তবে তা কঠোর ছিল না। এক বর্ণের লোক

অন্য বর্ণের পেশা গ্রহণ করতে পারত। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিয়েও হত। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা কম থাকায় কুষাণ, শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশীরা সহজে হিন্দুসমাজে মিশে যায়। গুপ্তযুগে হিন্দু ধর্মের প্রভাব কিছুটা বাড়লেও দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবই বেশি ছিল। দেশের কোথাও পশু মারা হত না, কেউ পেঁয়াজ-রসুন খেত না। কেউ শুয়োর-মোরগ পুষত না। শহরে মদ-মাংসের কোন দোকান ছিল না। চণ্ডাল ছাড়া সাধারণত কেউই মাংস খেত না বা পশু মারত না। চণ্ডালরা সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। তারা শহরের বাইরে বাস করত। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে রেষারেষি ছিল না।

গুপ্তযুগে ভারতীয় সমাজে নারীর খুব সম্মান ছিল। কখনও কখনও নারীরা বিভিন্ন কাজে পুরুষদের সাহায্য করতেন। মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা, নাচ-গান ও শিল্পকলার প্রচলন ছিল। পুরুষরা অনেক বিয়ে করতে পারত। কিন্তু উচ্চবর্ণের নারীদের একবারের বেশি বিয়ে করা এবং বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণত অভিভাবকরা মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। তবে কখনও কখনও তারা পছন্দমত বিয়ে করত।

ফা-হিয়েনের মতে ভারতবাসীরা ছিল ধার্মিক ও সত্যবাদী। দেশে চোর-ডাকাতের উৎপাত ছিল না। আইন-আদালত, মামলা-মোকদ্দমার সঙ্গে লোকের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। দেশে প্রচুর দাতব্য চিকিৎসালয় ও দানছত্র ছিল। পাটলিপুত্রে একটি বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। এই সব চিকিৎসালয়ে যত্নের সঙ্গে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা করা হত। শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে শোষণ করা হত না। সমাজে জ্ঞানচর্চার বিশেষ আদর ছিল। ভারতবাসীরা সহজ সরলভাবে জীবন কাটাত। ধর্ম সম্পর্কে তারা ছিল খুব উদার। গুপ্তযুগে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল।

● ১। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে মৌর্যযুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায়।

২। চীনা-পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণে গুপ্তযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায়।

১০ম পাঠ : প্রাচীন ভারতের শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞান

শিল্প ও স্থাপত্য—মৌর্যযুগের অথবা তার আগের কয়েকটি গুহাচিত্র ছাড়া প্রাচীন ভারতের অন্য কোন চিত্রশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে গুপ্তযুগে চিত্রশিল্প যে খুব উন্নত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অজন্তা ও বাঘ গুহার চিত্রগুলোর বেশির ভাগই গুপ্তযুগে আঁকা হয়। এই যুগে পাহাড় কেটে তৈরি করা গুহা-মন্দির অপূর্ব



অজন্তার চিত্র

শিল্প-কৌশলের পরিচয় দেয়। অজন্তার চিত্রগুলোর মধ্যে মাতা ও পুত্র, রাজকুমারীর মৃত্যু, চীনদেশের ভিক্ষুর উপস্থিতিতে বৌদ্ধধর্মসভা প্রভৃতি কয়েকটি চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তযুগে ধাতু-শিল্প খুব উন্নত ছিল। দিল্লীর কাছে চন্দ্ররাজের তৈরি লৌহস্তম্ভ ও নালন্দার তামার তৈরি একটি বুদ্ধমূর্তি সে-যুগের উন্নত ধাতু-শিল্পের পরিচয় দেয়।

প্রাচীন যুগের ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রায় কোন নিদর্শনই বর্তমানে অক্ষত অবস্থায় নেই। রাজগৃহ (রাজগীর), নালন্দা, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে তার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। অশোকের আমলে ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আরও উন্নত হয়। তিনি প্রায় এক হাজার স্তূপ তৈরি করান। তার মধ্যে একমাত্র ভিলসার স্তূপটি অক্ষত আছে। পাটলিপুত্রে তিনি যে নতুন রাজপ্রাসাদ তৈরি করান তারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে তিনি যে-সব স্তম্ভ নির্মাণ করান তার কয়েকটি বর্তমানেও দেখতে পাওয়া যায়। এই সব স্তম্ভের মসৃণতা ও গঠন-নৈপুণ্য আজও আমাদের মুগ্ধ করে।

কুষাণ-রাজা কণিষ্কের আমলে গান্ধার ও মথুরা অঞ্চলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি রীতি গড়ে ওঠে। এই রীতিকে গান্ধার শিল্প বলে। মথুরা ও তার কাছাকাছি অঞ্চল এবং পেশোয়ারে এই শিল্পের নমুনা এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

গুপ্তযুগের আগে হিন্দুধর্মে দেব-দেবীর মূর্তি-পূজা বা মূর্তি তৈরির বিশেষ প্রচলন ছিল না। কিন্তু গুপ্তযুগে বহু দেব-দেবীর ও বুদ্ধের মূর্তি তৈরি হয়। দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরি হতে থাকে।

সাহিত্য—বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থই ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য। পরে রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্য রচিত হয়। মৌর্য রাজাদের আমলে চাণক্য অর্থশাস্ত্র রচনা করেন। কণিষ্কের আমলে অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত রচনা করেন। তবে গুপ্তযুগে সম্রাটদের উৎসাহে ভারতের সাহিত্য আরও উন্নত হয়ে ওঠে। এই যুগেই কবি কালিদাস তাঁর বিখ্যাত কাব্য ও নাটক রচনা করেন। কালিদাসের মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি নাটক বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মৃচ্ছকটিক নাটকের লেখক শূদ্রক ও মুদ্রারাক্ষস নাটকের লেখক বিশাখদত্তও এই সময় জন্মগ্রহণ করেন। কবি হরিষেণ ও বীরসেন গুপ্তযুগের লেখক।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নিজেও কবি ছিলেন ; তাঁর উপাধি ছিল কবিরাজ। পরাশর সংহিতা, মনুস্মৃতি প্রভৃতি গুপ্তযুগেই সঙ্কলিত হয়।

শিক্ষা– প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্য, শিল্প, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তবে এদের মধ্যে নালন্দা ও তক্ষশীলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দুটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-বিহারে রাজগীরের কাছে নালন্দা অবস্থিত। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নালন্দার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নালন্দা ছিল বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

বর্তমান পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির কাছে প্রাচীনকালের তক্ষশীলা নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশীলার নাম খুবই পরিচিত। তবে চিকিৎসা-শাস্ত্রের শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেই তক্ষশীলার সবচেয়ে বেশি সুনাম ছিল। মগধের রাজা বিম্বিসারের রাজসভার চিকিৎসক জীবক তক্ষশীলার ছাত্র ছিলেন।

বিজ্ঞান—প্রাচীনকালে ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতি হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতে পাটলিপুত্রের জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট এবং মালবের বরাহমিহিরের নাম সবচেয়ে বেশি পরিচিত। আর্যভট্টই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিকগতি ও বার্ষিকগতির কথা বলেন। আর্যভট্টতন্ত্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। বরাহমিহিরের লেখা সূর্যসিদ্ধান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ। এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্যের সাহায্যে সকল অঙ্ক লেখার পদ্ধতি, দশমিক, ঘনমূল, বর্গমূল, দ্বিঘাত সমীকরণ ইত্যাদি পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীদের দান।

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র খুব উন্নত ছিল।

প্রাচীন ভারতে রস বলতে বোঝা যেত গাছ-গাছড়া, লতাপাতা পিষে রস বের করা অথবা জ্বাল দিয়ে ক্বাথ তৈরি করা। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে চরক আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেন। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে যে ঔষধ আয়ু বাড়ায়, জরা ও রোগ দূর করে তার নাম দেওয়া হয়েছে রসায়ন। সুশ্রুত, নাগার্জুন ও বসুমিত্র শল্য-চিকিৎসা, আয়ুর্বেদশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। পরেও প্রাচীন ভারতের অনেক পণ্ডিত রসায়নশাস্ত্র নিয়ে নানারকম গবেষণা করেন।

● প্রাচীন ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞান খুব উন্নত ছিল।

অনুশীলনী

১। ভারতে আসার আগে আর্যরা কোথায় বাস করত? ভারতে এসে তারা কোথায় প্রথম বসতি স্থাপন করে?

২। বেদ শব্দের অর্থ কি? বেদ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। রামায়ণ কে রচনা করেন? রামায়ণের কাহিনীটি সংক্ষেপে বল।

৪। মহাভারত কে রচনা করেন? মহাভারতের গল্পটি সংক্ষেপে বল।

৫। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে আমরা কি কি জানতে পারি?

৬। বৈদিক যুগে আর্যদের রাজনৈতিক অবস্থা কি রকম ছিল?

৭। বৈদিক যুগে আর্যদের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?

৮। বৈদিক যুগে আর্যদের ধর্ম সম্বন্ধে কি জান?

৯। জৈন ধর্ম কে প্রচার করেন? জৈন ধর্মের মূলকথা কি?

১০। বৌদ্ধধর্ম কে প্রচার করেন? বৌদ্ধধর্মের মূলকথা কি?

১১। মৌর্যবংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বল।

১২। অশোক সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বল।

১৩। কণিষ্ক কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৪। গুপ্ত রাজবংশের কে প্রতিষ্ঠা করেন? গুপ্ত রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে? তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে যা জান লেখ।

১৫। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের একটি বিবরণ দাও।

১৬। কিভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়?

১৭। প্রাচীন বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

১৮। ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার যোগাযোগের ফলাফল কি?

১৯। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২০। প্রাচীন ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২১। নালন্দা ও তক্ষশীলা সম্বন্ধে কি জান?

২২। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে কি জান?

২৩। প্রাচীন ভারতের রসায়ন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও:—

(ক) উপনিষদ কি? (খ) বৈদিক যুগে সমাজে ক-টা শ্রেণী ছিল? (গ) বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্মগ্রন্থ কি কি? (ঘ) মগধের রাজধানী কোথায় ছিল? সে জায়গার বর্তমান নাম কি? (ঙ) গান্ধার শিল্প কোথায় গড়ে ওঠে? (চ) প্রাচীন বঙ্গদেশের সীমানা কি? (ছ) প্রাচীন বঙ্গদেশের কয়েকটি রাজ্যের নাম বল। (জ) অশোক কোথায় ধর্মপ্রচারক পাঠান? শ্রীলঙ্কায় তিনি কাদের পাঠিয়েছিলেন? (ঝ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন্ কোন্ জাতির সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলেন? তিনি কাদের পরাজিত করেন? তাঁর দ্বিতীয় রাজধানীর নাম কি?

২৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—

(ক) কলিঙ্গের বর্তমান নাম —। (খ) কণিষ্কের রাজধানী ছিল —। (গ) মৌর্য-যুগে — ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। (ঘ) পাটলিপুত্রে একটি বিরাট — ছিল। (ঙ) অজন্তার চিত্রগুলোর বেশির ভাগই — যুগে আঁকা হয়। (চ) কালিদাস —, —, — প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

(ছ) মৃচ্ছকটিক নাটকের রচয়িতা —। (জ) আর্যভট্টের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম —। (ঝ) বিম্বিসারের রাজসভার চিকিৎসক — তক্ষশীলার ছাত্র ছিলেন।

২৫। সঠিক উত্তরের পাশে ✓ এই চিহ্ন দাও :—

(ক) মৌর্যযুগে সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল/ছিল না। (খ) মেগাস্থিনিসের মতে ভারতের লোকেরা লিখতে ও পড়তে জানত/জানত না। (গ) বঙ্গদেশের সঙ্গে মৌর্যদের যোগাযোগ ছিল/ছিল না। (ঘ) গুপ্তরাজবংশের প্রথম রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত/সমুদ্রগুপ্ত। (ঙ) গুপ্তদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র/দিল্লী।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road